স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রয়াত সশস্ত্র বিপ্লবী নারীদের উদ্দেশে

ভূমিকা

ভারত স্বাধীন হয়েছে অর্ধশতাব্দী হল। যে সমস্ত বাঙালি নারী দেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে সত্যিকারের কোন ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। অথচ একাধিক নারী ইংরেজ নিধনে হাতে তুলে নিয়েছিলেন আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ। নানা ঝুঁকি নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের নির্দেশে এই সব বিপ্লবী নারীরা জীবনপণ করে ইংরেজ প্রশাসনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ বা পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার এড়াতে সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কেউ বা গ্রেপ্তারের পর আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা অন্যান্য মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। যে মহিয়সী নারীরা সশস্ত্র বিপ্লবে শামিল হয়েছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন শিক্ষিত যুবতী। এ ছাড়াও পর্দার আড়ালে থেকে একাধিক নারী সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিলেন নানাভাবে। গুটিকয়েক সশস্ত্র বিপ্লবী নারীর কথা সাধারণ মানুষ জানলেও সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত বেশিরভাগ বিপ্লবী নারীর কথা সাধারণ মানুষ জানেন না। দেশের স্বাধীনতার পর এঁদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হয়নি। সশস্ত্র আন্দোলন ছাড়া অহিংস আন্দোলনের সাথেও যুক্ত ছিলেন বহু নারী বিপ্লবী। যদিও বর্তমান বইটিতে শুধুমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবী নারীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সব সশস্ত্র বিপ্লবী নারীদের কথা মনে করলে বোধ হয় বলা যায় —এঁরা শুধু দেশের জন্য দিয়েই গেলেন, পেলেন না কিছুই।

যতটা সম্ভব এই সব নারী বিপ্লবীদের নিয়ে বইটিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। হয়তো এ ছাড়াও আরো অনেকেই সশস্ত্র বিপ্লবের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাদের খোঁজ না-পাওয়ায় সেইসব মহিয়সী নারীদের কথা তুলে ধরা সম্ভব হল না।

আজ ভাবতে কষ্ট লাগে, এই সব সশস্ত্র বিপ্লবী নারীরা ছবি হয়েও দেওয়ালে জায়গা পেলেন না। মনের আন্তরিক শ্রদ্ধা পাওয়া তো দূরের কথা।

একাধিক মামলার নথিপত্র থেকে এবং কিছু বইপত্র থেকে ঘটনাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

আশাকরি এই সব নারীদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরির প্রচেষ্টা হবে এবং এই প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের এদের কথা জানানোর জন্য তাদের পাঠ্যপুস্তকে এইসব সশস্ত্র নারী বিপ্লবীরা স্থান পাবেন।

লেখকের অন্যান্য বই :

পাকুড় হত্যা মামলা

দেবযানী হত্যা মামলা

শকুন্তলা হত্যা মামলা

আদালতের আঙিনায়

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা

বারাঙ্গনা ব্যভিচারিণী ও আদালত

একগুচ্ছ রক্তকরবী

ধর্ষিতা

সাহিত্যে অশ্লীলতার দায়ে বিচার

এক ঝাঁপি কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন ও অপারেশন বর্গা

যে সশস্ত্র নারী বিপ্লবীরা বইটিতে স্থান পেয়েছেন সঙ্গে রয়েছেন পরোক্ষভাবে সাহায্যকারী নারীরা

শ্রীমতী পারুল মুখার্জি।
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।
কল্পনা দত্ত।
উজ্জ্বলা মজুমদার।
সুনীতি চৌধুরী।
শান্তি ঘোষ।
প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম।
বীণা দাস ভৌমিক।
রানী গুইদালো।
লীলা নাগ।
লীলা রায়।
প্রমীলা।
ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।
সাবিত্রীবালা দেবী
প্রভাসরনজিনি দেবী।
শান্তি সেন।
কুসুমরেণু দেবী
রমা সেন।
চারুশীলা দেবী।
কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়।
কমলা দাশগুপ্ত
প্রভাবতী দেবী চৌধুরাণী।
সিস্টার নিবেদিতা।
অ্যানি বেসান্ত।
শ্যামলী (স্কটিশের ছাত্রী)
ননীবালা দেবী।
স্বর্ণকুমারী দেবী
বুড়ি ভট্টাচার্য

পরাধীন ভারতবর্ষকে যে সব বিপ্লবী দেশপ্রেমিক নারী ব্রিটিশ প্রশাসন থেকে মুক্ত করার মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে এসে সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী পুরুষ বিপ্লবীদের সাথে একযোগে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন তাঁদের নিয়ে বোধহয় আজও কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হয়নি। এই প্রজন্মের অনেকেই জানেন না তাঁদের বিপ্লবী জীবনের কথা। পুরনো ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা ওঁদের বিপ্লবী জীবনের কথা কিছু কিছু জানতেন তাঁরাও বোধহয় আজ ভুলে গিয়েছেন ওদের সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণের রোমহর্ষক কাহিনী। যদিও কোন কোন বইতে খাপছাড়া ভাবে সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে যে সব নারী বিপ্লবী যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের পরিবারের যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন তাঁরা ছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানকারী সশস্ত্র বিপ্লবী নারীদের প্রকৃত ইতিহাস বোধহয় অন্য কারো ভালভাবে জানাও নেই।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—যে সব মহান নারী তাঁদের জীবনের বিনিময়ে বিপ্লবী দলে ও বিপ্লবী কাজে যোগ দিয়েছিলেন এবং যাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল পরাধীন দেশের মুক্তি তাঁরা কি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রাপ্য সম্মানটুকু পেয়েছেন?

সশস্ত্র বিপ্লবী দলের জীবিত সদস্যরাই বা কেন সোচ্চার হলেন না সশস্ত্র আন্দোলনে যোগদানকারী নারী বিপ্লবীদের ইতিহাস তুলে ধরতে?

তাছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের পর যাঁরা স্বাধীন ভারত পরিচালনা করার দায়িত্ব তুলে নিলেন তাঁরাও একবারের জন্য ভাবলেন না স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র নারীদের ভূমিকার কথা এবং যে সব দেশপ্রেমিক যুবতী পরোক্ষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবকে তাঁদের কথা?

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে তবুও কি অস্বীকার করা যাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা নেই। ভাবা যায় তদানীন্তন সময়ে শিক্ষিত যুবতীরা এসে পিস্তল হাতে তুলে নিয়ে ইংরেজ নিধন যজ্ঞে শামিল হয়েছিলেন। অনায়াসে জীবন বলিদান করেছিলেন ইংরেজের সাথে লড়াই করে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইংরেজ প্রশাসন যেই গদিগুলি খালি করে দিয়েছিলেন, সেই গদিগুলিতে বসার জন্য লড়াই চলেছে ক্রমাগত।

স্বাধীনতার রসাস্বাদনে চলেছে এক নিদারুণ প্রতিযোগিতা। যারা এই প্রতিযোগিতায় শামিল তাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না ভারতের মুক্তি মন্ত্রে কোন কোন দেশপ্রেমিক। ব্রিটিশ প্রশাসনকে ভারতবর্ষের মাটি থেকে সরাতে সমাজ-সংসার ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে লড়াই করেছিলেন জীবনের মায়া ত্যাগ করে। সশস্ত্র যুবক বিপ্লবীদের মতই পরাধীনতার গ্লানি জন্মেছিল তাদের মনে। বিপ্লবী দলের কাছ থেকেও তাঁরা যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছিলেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক এবং বিশেষভাবে বর্তমান নেতৃত্ব স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন কী ভাবে? পরাধীন ভারতবর্ষকে ইংরেজের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে যেই সব মহীয়সী সশস্ত্র বিপ্লবী নারী নিজেদের জীবন সঁপে দিয়েছিলেন দেশের জন্য, ছেড়েছিলেন ঘর-সংসার তাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে ছবি হয়েও দেওয়ালে স্থান পাননি। মনের কোণে স্থান পাওয়া তো দূরের কথা। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের স্বাধীনতার জন্য এইসব নারীদের শিখতে হয়েছিল লাঠিখেলা, ছোরাখেলা এবং আগ্নেয়াস্ত্র চালানো। তাঁদের জানতে হয়েছিল বোমা বানানো, বোমা নিক্ষেপ করা এবং গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে বিপ্লবী দলের নেতৃত্বের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার কায়দা-কানুন।

নারী বিপ্লবীরা নানাভাবে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসনের গুপ্ত খবর সরবরাহ্ করতেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। নারী বিপ্লবীদের গুপ্ত খবরের ভিত্তিতে বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক করতেন। বিপ্লবী নেতৃত্ব খুব সতর্কতার সঙ্গে উপযুক্ত যুবতীদের বেছে নিতেন বিপ্লবী দলে।

বিপ্লবী দলের সংগ্রহ্ করা বহু গুপ্ত অস্ত্র নারী বিপ্লবীদের হেফাজতে রাখা হত। স্বভাবতই ইংরেজ প্রশাসন বহু চেষ্টা করেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই সব গুপ্ত অস্ত্রের সন্ধান পাননি। বিপ্লবী দলের সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের সংখ্যা ছিল অবশ্যই নগণ্য। তবে তাঁরা ছিলেন দলের নির্ভরশীল সদস্য।

অনেকক্ষেত্রে দলের নারী বিপ্লবীদের আগাম খবরের ভিত্তিতে বিপ্লবী

নেতৃত্ব গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন। সঠিক তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিস সশস্ত্র বিপ্লবী দলের নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করতে এসে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছে।

বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য না হয়েও পরোক্ষভাবে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন একাধিক মহান নারী। বিপ্লবী দলকে মনে মনে সমর্থন করায় অনেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। ইংরেজ প্রশাসন জানতে পারলে ঘোরতর বিপদ নেমে আসবে বুঝেও বাংলার সাধারণ ঘরের বহু নারী সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রয়োজনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই সব সাহায্যকারী নারীদের নাম চিরকাল হয়ত চাপা পড়েই থাকবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু শিক্ষিত পরিবার হারিয়ে ছিলেন তাদের বাড়ির অগ্নিদীপ্ত মেয়েকে। বহু পরিবারের মা-বউরা পুলিসের অত্যাচার সহ্য করেও ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে মুখ খোলেনি। অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও বিপ্লবীদের জেরার সন্ধান তাদের কাছ থেকে ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিস বের করতে পারেনি।

যে সব সশস্ত্র নারী নিজেদের জীবনের বিনিময়ে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের হয়ে স্বাধীনতার ভিত তৈরি করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের পরিবার কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘকাল বাদেও প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা পাননি। অবশ্যই বিপ্লবী দলের সশস্ত্র নারী সদস্যারা কোন কিছু পাওয়ার আশায় দেশের মুক্তিমন্ত্রে নিজেদের উৎসর্গিত করেননি। তবুও কি স্বাধীন ভারতের নেতৃত্বের উচিত ছিল না সেই সব মহান বিপ্লবী নারীদের কথা মনে রাখা?

সশস্ত্র বিপ্লবী নারী ও তাঁদের দল শুধু দেশের জন্য দিয়েই গেলেন, পেলেন না কিছুই। অন্ততপক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের পর তাঁদের অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় সঠিকভাবে স্থান পাওয়া কাম্য ছিল।

কিছু কিছু লেখক প্রসঙ্গক্রমে বিচ্ছিন্নভাবে, বিভিন্ন সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের নিয়ে কিছু কিছু কথা লিখলেও সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের নিয়ে পূর্ণ ইতিহাস আজও তৈরি হয়নি।

যতই অহিংসবাদের কথা বলা যাক না কেন, সশস্ত্র আন্দোলনের সূচনা না হলে কি ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসন কম্পিত হতেন, না ভারতবর্ষ থেকে মানে মানে পাততাড়ি গোটাতেন।

নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যাবে না সশস্ত্র বিপ্লবী দল গঠন হওয়ার অনেক আগে থেকেই স্বদেশীরা ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। অহিংস আন্দোলনের বিরাট ভূমিকার কথা অস্বীকার করা না গেলেও বাস্তবে ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলি। একাধিক নারী সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

অন্যদিকে একাধিক শিক্ষিতা নারী অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিদেশি দ্রব্য বর্জন করেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন পিকেটিংয়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনে এঁদের অবদানও কম ছিল না। অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী মহীয়সী নারীদের জীবন কাহিনী আমার বক্তব্যের বিষয় নয়। বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়বস্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র নারী বিপ্লবী। যাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার মতো মারণাস্ত্র হাতে নিয়ে ইংরেজ প্রশাসককে হত্যা করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

এ ছাড়াও পরোক্ষভাবে সশস্ত্র বিপ্লবকে যে সব নারীরা সহযোগিতা ও সাহায্য করেছিলেন তাদেরও বিশেষ কারো কারোকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নিয়েছি।

যে সব নারী সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাও দলের যুবকদের সাথে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন বিপ্লবী দলের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। নারী বিপ্লবীরাও জানতেন না মৃত্যু তাঁদের কখন কী অবস্থায় হাতছানি দেবে অথবা ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিস তাঁদের কখন কোন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করবে।

যে সব সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন অবিভক্ত বাংলার মেয়ে। যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন বিপ্লবী দলে। দলের কাজের জন্য দলের নেতৃত্ব তাঁদের নানাভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁরাও দলের নির্দেশ যথাযথ পালন করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন।

এই সব নারী বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ কেউ অসীম সাহসে ব্রিটিশ সৈনিকদের সাথে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছেন আবার কেউ কেউ বা গ্রেপ্তার হয়ে আদালতের রায়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব করার অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত

হয়েছিলেন। অনেক বিপ্লবী নারী আবার বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডেও দণ্ডিত হয়েছেন। জেল হওয়ায় এই সব সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না। ভয় বলে বোধ হয় ওঁদের জীবনে কিছু ছিল না।

এই সব নারী বিপ্লবীদের কথা স্মরণ করলে গর্বে মন ভরে যায়।

এই লেখায় শুধুমাত্র কয়েকজন বিপ্লবীর মামলাকে কেন্দ্র করে সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে পর্দার পিছনে থেকেও যাঁরা বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিলেন অনেক ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের কারো কারো কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছে। সশস্ত্র বিপ্লবী দলের এই নারী বিপ্লবীরা প্রায় সবাই ছিলেন সাধারণ বাঙালি ঘরের মেয়ে।

সশস্ত্র বিপ্লব বোধহয় ওঁদের ডাক দিয়েছিল। পরাধীন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসনের সাধারণ ভারতবাসীর উপর অত্যাচার ও বেআইনি কার্যকলাপ ওঁদের বাধ্য করেছিল নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে বিদ্রোহিনী হতে।

বাংলার অনেক স্বাধীনচেতা নারী ব্রিটিশ প্রশাসনের কার্যকলাপ মেনে নিতে না পারলেও সোজাসুজি হয়ত ঘর-সংসার ছেড়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে পারেননি। তা না পারলেও এই সব স্বাধীনচেতা নারী গুপ্তভাবে দেশের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী সৈনিকদের সাহায্য করেছেন নানাভাবে। এই জন্য তাঁদেরও অনেককে সহ্য করতে হয়েছে অনেক অত্যাচার।

দেশের পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার অসম সাহসী নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। পরাধীন ভারতে একাধিক বিপ্লবী দল ছিল। প্রীতিলতা ছিলেন চট্টগ্রাম রিপাব্লিকান আর্মির সদস্যা। দলের নেতা ছিলেন শ্রী সূর্যকুমার সেন ওরফে 'মাস্টারদা'। কল্পনা দত্তও ছিলেন একই বিপ্লবী দলে। 'মাস্টারদার' নির্দেশই ছিল তাঁদের কাছে শেষ কথা। শ্রমতী পারুল মুখার্জি ছিলেন টিটাগড় গ্রুপে। এ ছাড়া রানী ভট্টাচার্যও ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী দলে। উজ্জ্বলা মজুমদারের কথা অবশ্য অনেকেই জানেন। তিনি ছিলেন ঢাকার মনোরঞ্জন ব্যানার্জির গ্রুপে। শ্রীমতী পারুল মুখার্জিকে বিপ্লবী কাজকর্ম করতে গিয়ে একাধিক ছদ্মনামের সাহায্য নিতে হয়েছিল। ছদ্মনামের আড়ালে কাজ করায় ব্রিটিশ সরকারের পুলিস বহুদিন তাঁকে পারুল মুখার্জি হিসেবে চিনতে পারেনি।

সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হলে স্বভাবতই বিপ্লবী দলের কথা এসেই যায়। বিপ্লবী দল নিয়ে কথা উঠলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে কী ভাবে এই দলগুলি গঠন করা হয়েছিল এবং দলের সদস্যরা কী ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশের মুক্তি সংগ্রামে।

বিপ্লবী দলের একনিষ্ঠ সদস্যরা ব্রত গ্রহণ করেছিলেন পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে যে কোন উপায়ে তাঁরা দেশকে মুক্ত করবেনই। লুঠেরা ইংরেজকে তাঁরা বুঝিয়ে দেবেন তাঁরাও স্বাধীন ভাবে বাঁচতে জানেন। দেশ থেকে ইংরেজ তাড়িয়ে তাঁরা স্বাধীনতার পরশ নিতে জানেন।

অনেককাল ধরে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা শুরু হলেও বিংশ শতকের প্রথম দশকে সম্ভবত ১৯০৬-০৭ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশের ঢাকা শহরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'। এর ঠিক আগে ১৯০৫ সালে পরাধীন ভারতবর্ষের ইংরেজ প্রশাসন তাদের প্রশাসনিক স্বার্থে বাংলাকে খণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলার বুকে শুরু হয়েছিল 'বঙ্গভঙ্গ' বিরোধী আন্দোলন।

এই 'বঙ্গভঙ্গ' বিরোধী আন্দোলনে তদানীন্তনকালে যোগ দিয়েছিলেন বহু ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতী। এ ছাড়াও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চারিত হয়েছিলেন বহু শিক্ষিত মানুষ। বলা যায় বাংলার সব স্তরের মানুষের কাছ থেকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল। দেশপ্রেমিক মানুষ ইংরেজের এই পরিকল্পনাকে মেনে নিতে পারছিলেন না।

কিন্তু প্রতিবাদের কোন আওয়াজই ইংরেজ প্রশাসনকে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারল না। বাঙলার মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে বাঙলাকে খণ্ডিত করলেন ভারতবর্ষের ইংরেজ প্রশাসন। সৃষ্টি করা হল একটি নতুন রাজ্যের। নতুন রাজ্যটির নামকরণ করা হল 'ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম'।

ইংরেজদের প্রশাসনিক স্বার্থে বাঙলার বিভাজন ঘটলেও এই সময় থেকে বাংলার যুবশক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল ভারতের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ। বঙ্গভঙ্গের ঠিক পরেই ঢাকায় এসেছিলেন কলকাতা থেকে শ্রী পি মিত্র। এক বিরাট জনসভায় শ্রী পি মিত্র জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বাংলার যুবশক্তিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তমন্ত্রে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে।

শ্রী পি মিত্রের আহ্বানে ঢাকার কিছু যুবক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শ্রী পুলিনবিহারী দাস সহ বেশ কয়েকজন যুবক এগিয়ে এসেছিলেন দেশের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করার শপথ নিয়ে।

তাঁদেরও ধারণা হয়েছিল—ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে দেশের মুক্তির জন্য তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরলে এই বিদেশি শাসককে দেশের মাটি থেকে চিরকালের জন্য সরানো যাবে না। ওদের দেশ থেকে বিদায় না করতে পারলে গরিব ভারতবাসীর মুক্তি নেই। লাঞ্ছিত ভারতবাসী ক্রমাগত লাঞ্ছিত হবে।

পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে ১৯০৬-০৭ সালে ৫০ নম্বর বাড়িতে উয়াড়িতে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অনুশীলন সমিতির বাড়িটিকে আগে 'ভূতের বাড়ি' নামে ঢাকাবাসীরা জানতেন।

ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রকৃত অর্থে ছিল একটি সশস্ত্র বিপ্লবী দল। পরে অবশ্য ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতৃত্ব অনুশীলন সমিতির শাখা সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছিল একাধিক বিপ্লবী সমিতি। এই সব শাখা সংগঠনগুলির মধ্যে বিশেষ করে নাম করা যায় নারায়ণগঞ্জ ব্রতী সমিতি, সিরাজগঞ্জ বান্ধব সমিতি, সোনাময়ী সমিতি, মধ্যপাড়া সমিতি, হবিগঞ্জ সমিতি, সতীপাড়া সমিতি প্রভৃতি।

ঢাকা অনুশীলন সমিতির পরিচালনায় এই সব শাখা সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। সমিতির বিপ্লবী সমিতির সদস্যপদ নেওয়ার সময় বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হত। সভ্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত মিলিটারি কায়দায়।

ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মাবার জন্য সমিতির সদস্যদের পড়তে দেওয়া হত বিপ্লবী পুস্তক-পুস্তিকা। ইস্তারহার ছাপিয়েও ছড়ানো হত। এই সব ইস্তাহারগুলি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমিতির সভ্যদের লাঠিখেলা, তরবারী ব্যবহার, বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে বোমা তৈরি এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ দেওয়াও শুরু হয়েছিল বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে।

অন্যদিকে সেই সময় অর্থাৎ ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরের কাছে নারায়ণগড়ে ভারতবর্ষের তদানীন্তন লেঃ গভর্নরের ট্রেনটিকে ট্রেন

লাইন সমেত উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক লেঃ গভর্নরের জীবন বেঁচে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই ঘটনার তদন্ত করেছিলেন ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিস অফিসাররা।

১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এবং শরৎচন্দ্র দে যোগজীবনের রিভলভারটি নিয়ে মেদিনীপুর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।

ইংরেজ প্রশাসনের কাছে গুপ্ত খবর ছিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোস সেই রিভলভার থেকে তদানীন্তন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টনকে গুলি করে হত্যা করবেন। সেই জন্যই তিনি যোগজীবনের রিভলভারটি তাঁকে না জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

একদিকে চলছিল সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি আবার অপরদিকে চলছিল স্বদেশিদের দ্বারা অহিংস আন্দোলন। স্বদেশি আন্দোলনে বহু সংগ্রামী নারীও যোগ দিয়েছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে শামিল হওয়া মহিলারা পুরুষদের সাথে বাজারে বাজারে পিকেটিং করেছিলেন। স্বদেশিদের স্লোগান ছিল 'বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশি কাপড় ব্যবহার কর'। দেশের বহু মহিলা পুরুষ স্বদেশিদের অনুরোধ মেনে বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

যতদূর জানা যায় এই সময় কলকাতা থেকে বিশেষ প্রয়োজনীয় দুটি বিপ্লবী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তিকা দুটির মধ্যে একটির নাম ছিল 'বর্তমান রণনীতি' "The Art of Modern welfare"। অপর পুস্তিকাটির নাম ছিল 'মুক্তি কোন পথে' " The way of Salvation lies"।

মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল "মেদিনী-বান্ধব" নামে একটি দৈনিক পত্রিকা। 'বর্তমান রণনীতি' এবং 'মুক্তি কোন পথে' বই দুটির মূল্য ধার্য করা হয়েছিল বারোআনা।

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরামের নিক্ষেপ করা বোমায় ভুলবশত মুজাফফ্‌রপুরে মৃত্যু ঘটেছিল কেনেডি পরিবারের দুজন মহিলার। কেনেডি পরিবারের মহিলাদের মৃত্যু ঘটানো ক্ষুদিরামের কখনই উদ্দেশ্য ছিল না। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম সেই কথা নিজমুখে স্বীকার করেছিলেন। ক্ষুদিরাম এর পর পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিলেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল। প্রফুল্ল চাকি পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে নিজের

রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেছিলেন। সেই সময় থেকে একটা অগ্নিগর্ভ অবস্থা চলছিল।

সশস্ত্র বিপ্লব এবং অহিংস আন্দোলন পাশাপাশি চলায় ইংরেজ প্রশাসন দারুণভাবে খেপে উঠেছিল। ধরপাকড় চলছিল ভীষণভাবে। কিন্তু যুবশক্তিকে রুখবে কে। মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন না নব বিপ্লবী দলের সদস্যারা। বুঝেসুঝেই বন্ধুর পথ বেছে নিয়েছিলেন ভয়লেশহীন যুবশক্তি।

পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লবী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবী দল গড়ার কাজ।

সশস্ত্র আন্দোলন সংঘটিত করতে প্রয়োজন ছিল বিশাল অর্থের। বিপ্লবীদের ডাকাতি পর্যন্ত করতে হয়েছিল অর্থ যোগান দিতে।

ভারতবর্ষের প্রায় সব বিপ্লবী দলগুলিরই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন রক্তের বিনিময় ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। মাতৃভূমির মুক্তিমন্ত্রে শপথ নিয়ে বিভিন্ন বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন বহু কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী বিপ্লবী দলের একাধিক যুবক-যুবতী নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দলের নির্দেশে সশস্ত্র আঘাত হেনেছিলেন ভারতের ইংরেজ প্রশাসনের আমলাদের ওপর। হত্যা পর্যন্ত করেছিলেন ভারতের বসবাসকারী একাধিক ইউরোপিয়ানকে।

১৯০৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর কর্মযোগিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দর লেখা একটি বিশেষ চিঠি। চিঠিটির শিরোনাম ছিল—"আমার স্বদেশবাসীর প্রতি"। পত্রিকাটির মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

তদানীন্তন ভারতের ইংরেজ সরকার চিঠিটি পড়ে অভিযোগ এনেছিলেন শ্রীঅরবিন্দর চিঠিটি নাকি রাজদ্রোহিতামূলক। সরকারের বক্তব্য ছিল—"আমার স্বদেশবাসীর প্রতি" চিঠিটি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি জনরোষ তৈরি করা। চিঠিটির লেখক শ্রীঅরবিন্দ আত্মগোপন করায় সরকার পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছিল পত্রিকাটির মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীমনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারায়, "আমার স্বদেশবাসীর প্রতি" চিঠিটি

ছাপানোর জন্য নিম্ন আদালত শ্রীমনোমোহন ঘোষকে দণ্ডিত করেছিলেন। পরে অবশ্য আপিলে মুক্তি পেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দর ভ্রাতা ব্যারিস্টার শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

১৯০৫ থেকে ১৯৩৫। এর মধ্যে ভারতবর্ষের বুকে ঘটে গিয়েছিল নানা ঘটনা। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯২০ সালে। অবশ্য সেই সময় অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাশামতন সাড়া জাগাতে পারেনি। সুভাষচন্দ্র বোস ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরেছিলেন ১৯২১ সালে। সুভাষ বোস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন দেশবরেণ্য শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের অনুপ্রেরণায়। অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে গান্ধীজীর সাথে শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের অনেক ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও তিনি গান্ধীজীর মত ও পথ শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন। শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসকে তাঁর নেতা হিসেবে শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিয়েছিলেন। স্বভাবতই শ্রীসুভাষ বোসকে গান্ধীজীর নীতিকে মেনে নিতে হয়েছিল। ভারতের বিপ্লবী দলের সদস্যরা গান্ধীজীর মত ও পথ মেনে নিতে পারেনি।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস বিপ্লবীদের মতাদর্শ মেনে নিতে না পারলেও কিন্তু বি প্লবীদের গভীর স্বদেশ প্রেম, স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহা ও আত্মত্যাগের প্রতি তাঁর একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিপ্লবীদের তিনি কখনই খাটো চোখে দেখেননি। দেশবন্ধুর জন্যই বিপ্লবীরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেসের আন্দোলনে বিরোধিতা করেননি।

বিরোধীরা অর্থাৎ বিপ্লবী দলের সদস্যরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতা না করায় অসহযোগ আন্দোলন অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবীরা বুঝে গিয়েছিলেন দেশবন্ধু তাদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পছন্দ না করলেও তাঁদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাই অন্যান্য অহিংসবাদী নেতাকে তাঁরা মেনে নিতে না পারলেও শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসকে তাঁরা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। সমস্তরকম বিলাসিতা বর্জন করে তিনি তাঁর সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে।

আবারও উল্লেখ করা যাচ্ছে ১৯০৫ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

পরাধীন ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবীদের কণ্ঠে আওয়াজ উঠেছিল—

"ইংরেজ তুমি ভারত ছাড় অন্যথায় ইংরেজ খতম কর।" তার পরেই শোনা যেত—"বন্দেমাতরম।"

বহু কিশোরী ও যুবতী গলা মিলিয়ে ছিলেন বিপ্লবী দলের যুবকদের সাথে। সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন বিপ্লবী দলের নির্ভিক যুবকদের। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তারা বিপ্লবীদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

সাধারণ ভারতবাসী যখন ব্রিটিশ শাসনে জর্জরিত তখন ব্রিটিশ প্রশাসনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশের নির্ভিক যুবক যুবতী। এই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে একাধিক নিবন্ধ ছেপেছিলেন বহু পত্র- পত্রিকা। যে সব পত্র-পত্রিকা সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জানিয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, সেই সব পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক রাজরোষে পড়েছিলেন।

১৯০৭ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। তাঁর সম্পাদনায় 'যুগান্তর' পত্রিকায় একটি উত্তেজক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। নিবন্ধটি ছাপা হয়েছিল ১৯০৭ সালের ১৬ জুন। নিবন্ধটি প্রকাশের জন্য শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে রাজরোষে পড়ে দণ্ডিত হতে হয়েছিল।

তখন 'যুগান্তর' ছাপা হত 'সাধনা' প্রেস থেকে। 'সাধনা' প্রেসের মালিক ছিলেন শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সাধনা প্রেসটিকে বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছিলেন ভারতের ব্রিটিশ সরকার। পরে অবশ্য আদালতের আদেশে বাজেয়াপ্ত করার আদেশটি উঠে গিয়েছিল।

যুগান্তরের মতই ফরওয়ার্ড পত্রিকাটিও ইংরেজের কু-দৃষ্টিতে পড়েছিল। 'ফরওয়ার্ড' নামে ইংরেজি পত্রিকাটি ছিল বিদেশি প্রশাসনের চক্ষুশূল। ভারতবাসীর উপর ইংরেজের অন্যায় অবিচার দেখলে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকাটি দৃঢ়তার সাথে, তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠত। ১৯২৬ সালে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী। পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন শ্রীপুলিনবিহারী ধর। কলকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত।

১৯২৬ সালের ৭ জুলাই পাবনার আইন-শৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা 'Anarchy in Pubna' শীর্ষক একটি নিবন্ধ ছেপেছিলেন। এই নিবন্ধটি ছাপায় শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী ও শ্রীপুলিনবিহারী ধরকে ইংরেজ প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছিল নিবন্ধটি রাজদ্রোহিতামূলক।

নিবন্ধটির আসল উদ্দেশ্য নাকি ছিল সাধারণ মানুষের কাছে সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা। সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল দণ্ডনীয় অভিযোগ। তদানীন্তন চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সীকে দণ্ডিত করেছিলেন। শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সীকে দেওয়া হয়েছিল তিন মাসের জেল ও ৩০০ টাকা জরিমানা। শ্রীপুলিনবিহারী ধরকে দিতে বলা হয়েছিল ২৫০ টাকা জরিমানা।

নিবন্ধটিতে নির্ভিকভাবে বলা হয়েছিল—ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের নীতিই হল 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' এবং এই নীতিকে অনায়াসে বলা যায় 'ফেবারিট ওয়াইফ পলিসি'। এই নিবন্ধটিতে ব্রিটিশ সরকারের আঁতে ঘা লেগেছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক ও বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সীকে হয়ত এই প্রজন্মের গুটিকতক লোক জানেন। স্বাধীনতা তো পেয়েই গিয়েছি, এদের জানবার দরকার কী।

যদি স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ইতিহাস কোনদিন লেখা হয় তাহলে হয়তো শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সীর নাম সেই ইতিহাসে স্থান পাবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে পরাধীন ভারতবর্ষের দিকে দিকে তরুণ যুবক যুবতীর মনে পৌঁছেছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য এক অতলস্পর্শী ডাক। সুকান্তের ভাষায় বলা যায় :—

'রক্তে আনো লাল
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে
ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।'

স্বাধীনতা হয়ত আমরা পেয়েছি, কিন্তু আমরা ভুলে গিয়েছি দেশের জন্য প্রাণ নিবেদিত সশস্ত্র যুবক-যুবতীর কথা। ওদের কথা স্মরণ করে স্বাধীনতার এত বছর বাদেও কি আমরা মনে করতে পারি না—ওঁদের কথা মনে করেই কি লেখা হয়েছিল :—

পৃথিবী ও ইতিহাস কাঁপে
আজ অসহ্য আবেগে
ওদের পায়ের স্পর্শে মাটিতে সোনার ধান
রঙ লাগে মেঘে।
এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ

ওদের পতাকা,
মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী
আজ ঢাকা।

বিপ্লবীরা যদি সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন তাহলে দলের প্রয়োজন প্রচুর অস্ত্র। সেই অস্ত্রের মধ্যে থাকবে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা প্রভৃতি, স্বভাবতই অর্থ ছাড়া তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাকাতির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল বিপ্লবী দল। সেই সময় বিপ্লবীদের দিয়ে করা ডাকাতিগুলিকে বলা হত স্বদেশি ডাকাতি।

স্বদেশি ডাকাতিগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল চাংরিপোতা ডাকাতি, শিবপুর ডাকাতি, বরা ডাকাতি, বিঘাটি ডাকাতি, প্রতাপচকের ডাকাতি, রায়তা ডাকাতি, মহারাজপুরের ডাকাতি, হলুদবাড়ি ডাকাতি, রডা কোম্পানি ডাকাতি, হিলি স্টেশন মেল ডাকাতি প্রভৃতি।

রডা কোম্পানি থেকে ডাকাতি করা হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র।

যে কোন বিপদসংকুল কাজ করতে বিপ্লবী দল ভীত হননি। দলের নির্দেশই ছিল তাঁদের কাছে শেষ কথা। অবিচল ছিল তাদের মনোবল। ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁদের কাছে ছিল অতি তুচ্ছ। দেশের কাজ করতে এসে তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবতে পারতেন না।

সদস্য-সদস্যাদের আদর্শভ্রষ্টতা দেখলে দলের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটায় সদস্যদের উপযুক্ত শাস্তি পেতে হয়েছে। পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলতে প্রয়োজনে খুন পর্যন্ত করতে হয়েছে আদর্শভ্রষ্ট সদস্যকে। দলের নীতির সাথে কোন আপস ছিল না। সবকিছু জেনেশুনেই বিপ্লবী দলে আসতেন যুবক-যুবতীরা।

সংগঠনের মধ্যে দলাদলি দেখা দিলে শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হতে নেতৃত্বকে। সেখানে কোন আপস ছিল না।

সশস্ত্র আন্দোলনের কথা বলতে গেলে বিশেষ ভাবে মেদিনীপুর জেলাকে ভোলা যায় না। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মেদিনীপুরবাসী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের বিরুদ্ধে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসির আদেশ হয়েছিল।

১৯২১ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে একদা মেদিনীপুরের যুবক

শ্রীমানবেন্দ্র রায় বার্লিন এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন। জানিয়ে দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সিদ্ধান্ত, বিপ্লবী মতাদর্শ ব্যক্ত করে তিনি তাঁর লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন :—

"The infamous methods by which the British Imperialism sucks the life blood of the Indian people are well known. They cannot be condemned too strongly nor will simple condemnation be of any practical value. British rule in India was established by force; therefore, it can and will be overthrown only violent. revolution......................

The people of India must adopt violent means which the foreign domination based upon violence cannot be ended.

The people of India are engaged in the great revolutionary struggle. The Communist International is whole-heartedly with them."

মানবেন্দ্র রায়ের এই চিঠিটি থেকে বুঝতে কোন অসুবিধা ছিল না—"কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল" বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র আন্দোলন। অহিংসনীতিতে তাদের কোন বিশ্বাস ছিল না। এককথায় বলা যায় হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা নীতিকে বেছে নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল। রক্তের বদলা রক্ত দিয়ে। পবাধীন ভারতকে স্বাধীন করতে সশস্ত্র আঘাত হেনে বিরত করে তুলতে হবে ভারতবর্ষের ইংরেজ প্রশাসনকে। এই ব্যাপারে কোন ক্ষমার প্রশ্নই আসে না।

১৯১৩ সালে অবোধবিহারী ও আমীর চাঁদের নেতৃত্বে তৈরি করা হয়েছিল 'লিবার্টি' লিফলেট। দিল্লি থেকে লাহোরে পাঠানো হয়েছিল সেই লিফলেট। লিফলেটের একাংশে বলা হয়েছিল—

"God himself worked in Khudiram Bose, Prafulla Chaki, Kanailal Dutta, Madanlal Dhingra."

এর থেকে পরিষ্কার বিপ্লবীরা—ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকি, কানাইলাল দত্ত এবং মদনলাল ধিংরার প্রতি অতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

সশস্ত্র বিপ্লবে বেশ কিছু যুবতীও পিছিয়ে ছিলেন না। এইবার সেই আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যাক।

।। দুই ।।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বেশ কয়েকটি যুবতী সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া সামজিক ও অন্যান্য নানা কারণে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দিতে না পারলেও পরোক্ষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন বিপ্লবীদের। সশস্ত্র আন্দোলনে যোগদানকারী অগ্নিকন্যাদের নিয়ে একসাথে আজও ইতিহাস তৈরি হয়নি। আলাদা আলাদা ভাবে হয়ত তাদের নিয়ে কিছু কিছু কথা বলা হয়েছে।

তদানীন্তনকালের বিপ্লবীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলি পর্যালোচনা করলে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র নারী বিপ্লবীর কথা জানা যায়। তাছাড়াও বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা থেকেও পাওয়া যায় সেই নারীদের কথা যারা পর্দার আড়ালে থেকে সাহায্য, সহযোগিতা ও সাহস যুগিয়ে ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্যদের।

সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের নিয়ে যদি কোনদিন সঠিক ইতিহাস তৈরি হয় তাহলে পরোক্ষভাবে সাহায্যকারী নারীদের কথাও জানা যাবে। সেইসব নারীদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের অহিংস দিকটি তুলে ধরা কখনই সম্ভব নয়। যদিও এই ব্যাপারে শ্রমসাধ্য গবেষণার প্রয়োজন।

বর্তমান আলোচনায় যে সব সশস্ত্র নারীবিপ্লবী স্থান পেয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের মধ্যে আছেন টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার শ্রীমতী পারুল মুখার্জি, ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত, অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার উজ্জ্বলা মজুমদার, বাণী ভট্টাচার্য নামে যুবতীটিও বিপ্লবী দলেন ছিলেন।

মানসিক জোর এবং তেজস্বিতা থাকলে ভারতীয় নারীও যে অগ্নিকন্যা হয়ে উঠতে পারেন তা বোধহয় দ্বর্থহীনভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের মত করে আর কেউ বলেনি।

স্বামীজী যে বলেছিলেন ভারতীয় নারীজাতির মধ্যে রয়েছে এক বিরাট শক্তি। সেই শক্তিকে পদানত করে রাখা হয়েছে। স্বামীজী তাঁর একটি বাণীতে বলেছিলেন—নারী জাগরণের যে প্রয়াস গত দুই শতাব্দীতে পরিলক্ষিত

হয়েছে, সেই প্রয়াসের মাধ্যমে নারী জাতিকে পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছে দিতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ গভীরে প্রবেশ করে ভারতীয় নারীর সমস্যাটিকে দেখেছিলেন। তিনি ভারতীয় নারীর শক্তি অনুধাবন করে তাদের স্বাবলম্বী কবার কথা বলেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন কেবলমাত্র কতকগুলি আইনেব মাধ্যমে ভারতীয় নারীজাতিকে স্বাবলম্বী করা যাবে না।.

স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—ভারতীয় নারীদের দুরবস্থার আসল কারণ কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, পুরুষেবা তাদের মতামত ও চিন্তাধারা নারীদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। তিনি চেয়েছিলেন নারীদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে নারীরাই চিন্তা করুন। নিজেরাই সমস্যা বের করে তার সমাধান করুন। ত্যাগী ও শিক্ষিতা নারীরা ভার নিন প্রকৃত নারী শিক্ষার। পুরুষের চাপিয়ে দেওয়া মতাদর্শকে অনুসরণ না করে নিজেদের শক্তিকে বিকশিত করুন।

স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বৈদান্তিক তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে কী নারী, কী পুরুষ যখন যথার্থ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবেন যখন তাঁদের কাছে যে কোন সমস্যাই আসুক না কেন তারা সেই সমস্যা নিজেরাই বিচার বুদ্ধি দিয়েই মোকাবিলা করতে পারবেন।

সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের কথা বলতে গেলে ভারতীয় সাধারণ নারীদের কথা এসেই যায়।

স্বামীজী এক জায়গায় বলেছিলেন—"আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে কি তাহাই বলিব। ভারত ও ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাস কর। তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া গৌরব অনুভব কর।"

স্বামীজী খুব জোরের সাথে একটি বক্তব্য পেশ করেছিলেন :—

"আমি এমন একটা যন্ত্র চালাইয়া যাইব যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষই হউক আর নারীই হউক—নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে।"

স্বামীজী পুরুষ ও নারীদের একই শক্তিতে দেখেছেন। স্বামীজী কখনই মনে করেননি পুরুষের থেকে নারীর শক্তি দুর্বল। ইচ্ছে করলে যথার্থ শিক্ষা পেলে নারী পুরুষের মতই সব কাজ পারে।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারী সমস্যা নিয়ে এগিয়ে এলেও নারীদের বিপ্লবে যোগ দেওয়ার কথা বলেননি। ভারতীয় নারীদের বেশ কিছু সমস্যা তাঁরা মিটিয়েছিলেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সমাজচেতন মহামনীষীরা কখনই ভাবতে পারেননি ভারতীয় যুবতী স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নিতে পারেন।

সশস্ত্র বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব কিন্তু নারীশক্তিকে ছোট করে দেখেননি। তাঁরা যাচাই করে দেশের জন্য অর্পিত যুবতীদের নিয়েছিলেন দলের কাজে। গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন তাদের ওপর। সশস্ত্র বিপ্লবী নারী দলের নির্দেশ মতো তাঁদের ওপর দেওয়া দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছিলেন।

পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে বহু রকম সামাজিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ গিয়েছিলেন বাঙলার নারী পারুল মুখার্জি। শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে যুবকদের সাথে সমবেতভাবে বিপ্লবী কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীমতী পারুল মুখার্জির সশস্ত্র বিপ্লবী জীবনের আংশিক বিবরণ পাওয়া যায় টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায়। মামলাটি সম্বন্ধে না বললে পারুল মুখার্জির সশস্ত্র বিপ্লবী জীবনের কাহিনী বোঝা যাবে না। পারুল মুখার্জি ছিলেন বুদ্ধিমতী অসীম সাহসী এক নারী। ভারতমাতার পরাধীনতাকে তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। মনের ডাক পেয়েছিলেন প্রাণের বিনিময়ে বিপ্লবীদের সাথে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। পারুলের ছিল দারুণ আত্মবিশ্বাস। দেশের যুবকরা যদি দেশের জন্য জীবন বলিদান করতে পারেন তাহলে সেই বা পারবে না কেন। হলই বা সে নারী। মানসিক বল ও দৈহিক ক্ষমতা থাকলে নারী কেন দেশের মুক্তি আন্দোলনে পিছিয়ে থাকবে। পারুলের একটা ধারণা ছিল তাকে অনুসরণ করে ক্রমাগত এগিয়ে আসবে সাহসী মেয়েরা। কাজটা হয়ত কঠিন। কিন্তু কারোকে না কারোকে পথটা তো দেখাতে হবে।

ফিরে আসা যাক টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায়। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় ৩১জন বিপ্লবীর বিচার হয়েছিল একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে। স্পেশাল ট্রাইবুনালটি গঠন করা হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ৩১ অক্টোবর সরকারি আদেশ অনুসারে।

তদানীন্তন সময়ে বিপ্লবীদের মামলার বিচার সাধারণত হত স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করে।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলাটির বিচারের জন্য যে স্পেশাল ট্রাইবুনালটি গঠিত হয়েছিল সেই ট্রাইবুনালটিতে ছিলেন তিনজন বিচারক (কমিশনার)।

এই তিনজন বিচারক কমিশনারের মধ্যে ছিলেন মিঃ এইচ জি এস বিভার, আই-সি-এস, শ্রী কে সি দাশগুপ্ত এবং রায়বাহাদুর এন সি বোস। কমিশনার মিঃ বিভার এবং আই-সি-এস শ্রী দাশগুপ্ত সেই সময় ছিলেন জেলা ও দায়রা জজের পদে। রায়বাহাদুর এন সি বোস ছিলেন বাঁকুড়া জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর।

কমিশনার তিনজনের মধ্যে স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের সভাপতি ছিলেন মিঃ এইচ জি বিভার। সরকারি আদেশ মোতাবেক মিঃ বিভারকে স্পেশাল ট্রাইবুনালের সভাপতি পদে বসানো হয়েছিল।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী পারুল মুখার্জি। ৩১ জন অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে ২ জনকে করা হয়েছিল রাজসাক্ষী। বাকি ২৯ জনের বিচার হয়েছিল স্পেশাল ট্রাইবুনালটিতে।

অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে বিশেষভাবে যাদের নাম করা যায় তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীশ্যামবিনোদ পালচৌধুরী, শ্রীনিরঞ্জন ঘোষাল, শ্রীসতীনাথ দে, শ্রীঅজিত মজুমদার, শ্রীজীবন ধূপি, শ্রীদীনেশ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

টিটাগড় বিপ্লবী ডেরার প্রকৃত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল পারুল মুখার্জির ওপর। অস্ত্রশস্ত্র থাকত তাঁরই হেফাজতে।

অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১-এ ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছিল। এ ছাড়া পারুল মুখার্জি, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও শ্যামবিনোদ পালচৌধুরীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পদার্থ আইনেও চার্জ গঠন

করা হয়েছিল। ভারতীয় অস্ত্র আইনেও অভিযুক্ত করা হয়েছিল পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও শ্যামবিনোদ পালচৌধুরীকে।

মামলার তদন্ত, সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও নথিপত্র থেকে জানা গিয়েছিল টিটাগড় বিপ্লবীদের একটি আখড়া ছিল। টিটাগড় আখড়াটি ছাড়াও নানা জায়গায় বিপ্লবী দলের আখড়া ছিল। আখড়াগুলি থেকে পরিচালিত হত সশস্ত্র বিপ্লবের কাজকর্ম। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে শ্রীমতী পারুল মুখার্জি সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে দলের নির্দেশে বিপ্লবী যুবকদের সাথে একই ভাবে কাজ করে গিয়েছেন বলে তিনি পিছিয়ে থাকেননি।

টিটাগড়ের আখড়াটিকে আগলে রাখতেন শ্রীমতী পারুল মুখার্জি। এই আখড়াটির সাথে সম্পর্কিত বিপ্লবীদের অনেক সময় তাঁকেই পরিচালিত করতে হত।

সশস্ত্র বিপ্লবী কাজকর্মের স্বার্থে পারুল মুখার্জিকে একাধিক ছদ্মনাম নিতে হয়েছিল। এমন কী দলের সব বিপ্লবীরা পর্যন্ত সবাই জানতেন না পারুল মুখার্জির সবকটি ছদ্মনাম। কোন সময় পারুল মুখার্জি "নীহার" ছদ্মনামে কাজ করেছেন। কোন সময় তিনি পরিচিত ছিলেন "শান্তি" নামে। এছাড়াও তাঁর ছদ্মনাম ছিল "আরতি", "শোভারানী", "রানী", "খুকি" ও "সুরমাদেবী"।

দলের নির্দেশেই এক এক সময় এক রকম ছদ্মনাম নিয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। পারুল মুখার্জিকে ছদ্মনাম নিয়ে দলের কাজকর্ম করার সময় সামান্যতম বিচলিত হতে দেখা যায়নি।

শ্রীমতী পারুল মুখার্জি সবসময় দলের কাজকর্ম করতেন শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত এবং শ্রীশ্যামবিনোদ পালচৌধুরীর নির্দেশে। দলের এই নেতৃত্বদ্বয়ের আদেশ পারুল বিনা দ্বিধায় পালন করে আসতেন। অসম সাহসী এই নারী বিপ্লবী কোন কাজ থেকেই পিছিয়ে আসতেন না। আত্মবিশ্বাস ছিল অপরিসীম।

পারুল মুখার্জিকে নানা ধরনের অস্ত্রবিদ্যায় তালিম দেওয়া হয়েছিল। তিনি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে জানতেন। বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে

বোমা বাঁধতে পারতেন। লাঠি ও নানা ধরনের মারণাস্ত্র ব্যাবহার করতে পারতেন।

নারী হয়েও পারুল দেবী ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সম্পদ। বিপ্লবী কাজকর্মে উৎসাহিত হয়ে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলে দলের সদস্যরা পারুলদেবীকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন।

পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সরকার কোন সূত্রে টিটাগড়ের বিপ্লবী আখড়াটির খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ হানা দেওয়ায় বিপ্লবীরা বুঝতে পারেননি পুলিস আগমনের কথা। যখন পুলিস আখড়াটিকে ঘিরে ফেলেছিল তখন আর বিশেষ কিছু করার ছিল না।

শুরু হল পুলিসের তল্লাশি। টিটাগড়ের বিপ্লবী আখড়াটি তল্লাশি করে ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিস উদ্ধার করেছিল প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ। পুলিসের হানার আগে বিপ্লবীরা কিছুই আখড়া থেকে সরাতে পারেনি। পুলিস যখন আখড়াটি ঘিরে ফেলেছিল সেইসময় শ্যামবিনোদ পালচৌধুরীও টিটাগড় আখড়ায়।

শ্যামবিনোদ পালচৌধুরীর হেফাজতে থেকে পাওয়া গিয়েছিল গুলিভর্তি পিস্তল। পুলিসের উদ্ধার করা বিস্ফোরক পদার্থের মধ্যে ছিল সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, মেটা নাইট্রানিলিন, অ্যাবসেলুট অ্যালকোহোল, মার্কারি, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম নাইট্রেট, চারকোল, বোমা বাঁধতে উপরোক্ত দ্রব্যগুলি প্রয়োজন হত। টিটাগড় আখড়াটি বোমা বাঁধায় ছিল বিশেষ পারদর্শী। নানাভাবে বিপ্লবীরা সংগ্রহ করেছিলেন এই সব বিস্ফোরক পদার্থ।

উপরোক্ত বিস্ফোরক পদার্থ টিটাগড়ের গোয়ালপাড়ার আখড়া থেকে পাওয়া যাওয়ায় বিস্ফোরক পদার্থ আইনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল সরকার পক্ষ থেকে এবং অন্যান্যদের সাথে পারুল মুখার্জির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ৫-এ ধারার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবী পারুল মুখার্জি টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েও ভীত হননি। আসামীর কাঠগড়ায় অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে দিনের পর দিন

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সাক্ষীদের সাক্ষ্য নির্দিষ্ট মনে শুনেছেন। নারী হয়েও বোধ হয় পারুল মুখার্জির মত মেয়েরা ভয়কে জয় করেছিলেন।

টিটাগড় গোয়ালপাড়ার আখড়াটি থেকে পুলিস বিস্ফোরক পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র বাদেও পেয়েছিল একাধিক সন্দেহজনক বইপত্র। বইগুলির মধ্যে ছিল (১) Field Gunnery (২) Machine gunners Hand Book (৩) War equipment (৪) Infantry Training এবং (৫) Aeroplane Constructions.

এই বইপত্র আখড়ার বিপ্লবীর পড়তে দেওয়া হত। সশস্ত্র বিপ্লব করতে গেলে বিপ্লবীদের যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কিছুই শেখার ছিল। সেই কারণেই ওই সব বইপত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল।

বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের অভিযোগ ছিল তাঁরা টিটাগড়ের গোয়ালপাড়ার আখড়ায় মিলিত হয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে। বিপ্লবীরা সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে ভারতের মাটি থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে।

ভারতের ব্রিটিশরাজও দারুণভাবে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ভীষণভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদের জেলে পুরতে।

বিপ্লবীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে ভাবেই হোক ইংরেজ সরকারকে তাঁরা নির্মূল করবেনই। প্রাণ পণ রেখেই তো তাঁরা এই সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছেন।

টিটাগড় ষড়যন্ত্রের সময়সীমা ছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালের ৩১ অক্টোবর। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগপত্রটি দায়ের করেছিলেন ডেপুটি পুলিস সুপার রায়সাহেব কান্তিচন্দ্র মুখার্জি। কান্তিবাবুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয়েছিল। বিচারের শুরু ১৯৩৫ সালের শেষাশেষি।

সরকার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল টিটাগড় মামলার বিপ্লবীরা বাংলার ১৫টি জেলায় এবং বিহার, অসম ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছেন।

স্পেশাল ট্রাইবুনালে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শ্রীমতী পারুল মুখার্জি ব্রিটিশ প্রশাসানের পুলিসের আনা তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। যদিও দৃপ্ত ভাষায় আদালতকে জানাতে তিনি ভোলেননি পরাধীন দেশের মুক্তি আন্দোলনের সৈনিক হওয়া তাঁর কাছে কোন অপরাধমূলক কাজ নয়। অবশ্য তিনি ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্মের সাথে কখনই যুক্ত ছিলেন না। দেশকে মুক্ত দেখা যে কোন ভারতবাসীর নৈতিক অধিকার।

মামলার নথিপত্র থেকে দেখা যায়, স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে অভিযুক্ত আসামীরা আলাদা আলাদা ভাবে বক্তব্য রেখেছিলেন ১৯৩৬ সারেল ৫, ৭, ৮ এবং ৯ ডিসেম্বর; প্রত্যেক অভিযুক্তই তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

স্পেশাল ট্রাইবুনালের প্রধান মাননীয় কমিশনার অভিযুক্ত আসামীদের বক্তব্য নথিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন।

মামলাটি শুনানির সময় সাধারণ মানুষ মামলার বিবরণ জানার কৌতূহলে আদালতে ভিড় করতেন। সাধারণ মানুষের কাছে বিস্ময় ছিল পারুল মুখার্জির মত একটি সাধারণ বাঙালি নারী বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে অস্ত্রধারণ করতে কোনসময় কম্পিত হননি।

পারুল মুখার্জিকে দেখার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা। একটি যুবতীর মধ্যে দেশপ্রেম দেখে বাঙালি নারীরা গর্ব অনুভব করতেন। পারুল মুখার্জি নারীজাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মানসিক জোর এবং দেশপ্রেম থাকলেও নারীজাতির শক্তিকে ছোট করে দেখার কোন কারণ নেই।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষ থেকে ৫০২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৬ সালের ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে সাক্ষ্যসাবুদ নেওয়া শেষ হয়েছিল। পারুলের মুখ থেকে পুলিস একটি কথাও আদায় করতে পারেনি। সশস্ত্র বিপ্লবী কাজকর্মে অনেক গভীরে ঢুকে গিয়েছিলেন পারুল মুখার্জি। পারুল মুখার্জির বিপ্লবী চেতনাকে দলের নেতৃত্বও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন।

নথিপত্র থেকে বোঝা গিয়েছিল—পারুলের মতো মেয়েরা উপলব্ধি করেছিলেন নারী হলেও দেশের মুক্তিমন্ত্রে সশস্ত্র বিপ্লবে শামিল দাদা ভাইদের পিছনে দাঁড়িয়ে ভূমিকা নেওয়া যায়। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নারীদের প্রয়োজন ছিল। এই বিপ্লবী চেতনার থেকে ঘর, সংসার, স্বপ্ন সব কিছু ত্যাগ করে পারুল মুখার্জি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে দলের নির্দেশমতো কাজ করে গিয়েছিলেন। কোন প্রতিবন্ধকতা তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, পরাধীন ভারতবর্ষে তদানীন্তনকালে হয়ত বহু বাড়িতে একাধিক অগ্নিকন্যা ছিলেন। সামাজিক অনুশাসনে পারুল মুখার্জির মত সব ছেড়ে এসে হয়ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে তাদের কাজ করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু দলের বাইরে থেকেও তারা নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন বিপ্লবী দলগুলিকে। যে নারীরা বাইরে থেকে বিপ্লবী দলকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের নাম হয়ত কোনদিনই প্রকাশ পাবে না। যদিও পরবর্তীকালে কারো কারো নাম জানা গিয়েছিল। কিন্তু নাম জানলেও স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে হয়ত তাদের স্থান হবে না।

নানা ছদ্মনামে পারুল বহুরূপে কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ায় ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিস বিশেষত গোয়েন্দা বিভাগে অনেকদিন পর্যন্ত পারুল মুখার্জিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে পারুল মুখার্জিকে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল গোয়ালপাড়ার আখড়া থেকে।

৩১জন অভিযুক্তদের মধ্যে শ্রীসন্তোষকুমার সেন এবং শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাল রাজসাক্ষী হতে চাওয়ায় স্পেশাল ট্রাইবুনালের আদেশে এদের দুজনকে অভিযুক্ত আসামীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শেষপর্যন্ত বিচার হয়েছিল ২৯ জন অভিযুক্তদের।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় একজন অভিযুক্ত আসামী শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘটক গ্রেপ্তার বরণ করার পর কলকাতার তদানীন্তন একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিলেন। তার স্বীকারোক্তি থেকে পুলিস জানতে পেরেছিল বিপ্লবী দলের অনেক গোপন কথা। পুলিসের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল তদন্তকার্যে জগদীশবাবুর স্বীকারোক্তি পেয়ে। জগদীশবাবু অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তি অস্বীকার করেছিলেন স্পেশাল

ট্রাইবুনালের কাছে। তিনি নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন—তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তিটি কখনই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না। পুলিসের অত্যাচার অসহ্য হয়ে ওঠায় তিনি মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পুলিস তাঁকে যা বলতে বলেছিল সেইমত তাঁকে বলতে হয়েছিল। স্ব-ইচ্ছায় কোন কথাই তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেনি। সুতরাং তার স্বীকারোক্তি মূল্যহীন।

পারুল মুখার্জিকে দিয়েও স্বীকারোক্তি করার প্রচেষ্টা হয়ত বা নেওয়া হয়েছিল। পারুল ছিলেন নিশ্চুপ। পারুল মুখার্জি বুঝেছিলেন দেশের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশ থেকে বিদেশি প্রশাসনকে হঠাতে যখন নারী হয়েও অস্ত্র হাতে নিয়েছেন তখন আবার জীবনের ভয় কী? লড়াই করে মরতে হবে জেনেই তো এই বিপদসঙ্কুল পথ বেছে নিয়েছেন। এই জীবন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন নানা প্রতিকূলতার মধ্যে। সশস্ত্র বিপ্লবই তো ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। জীবনে বাঁচার জন্য শত্রুর কাছে নিজেকে হাসির পাত্র করবেন কেন?

স্পেশাল ট্রাইবুনাল বিচার-বিবেচনা করে ২৯ জন অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে ১৭জনকে দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। এ ছাড়া শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত এবং শ্রীশ্যামবিনোদ পালকে বিস্ফোরক পদার্থ আইনেও দণ্ডিত হতে হয়েছিল। উভয় দণ্ডই একসাথে চলার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত এবং শ্রীশ্যামবিনোদ পালচৌধুরীকে তদানীন্তন কালের লোকেরা শ্রদ্ধা করতেন। ভারতের ব্রিটিশ সরকারের চোখে এই দুই সশস্ত্র বিপ্লবী ছিলেন ত্রাস।

বোমা তৈরি এবং আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে এই দুই বিপ্লবী নেতার ভাল পড়াশোনা ছিল। ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাজকর্ম সম্বন্ধে নেতৃত্বদ্বয় ভাল ভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে আজ বোধহয় অনুসন্ধান করলে এই এই সব বিপ্লবী নেতার ছবিও পাওয়া যাবে না। তার মানে ওঁরা ছবি হয়েও স্থান পেলেন না স্বাধীন ভারতের নাগরিকের দেওয়ালে। তলিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অতলে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে—টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার ৬ জন দণ্ডিত আসামী শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীনিরঞ্জন ঘোষাল, শ্রীসতীনাথ দে, শ্রীঅজিত মজুমদার, শ্রীজীবন ধূপি এবং দীনেশ ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে আন্তরাজ্য ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এমন কী আন্তঃরাজ্য ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীসতীনাথ দে এবং শ্রীনিরঞ্জন ঘোষালকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১-এ ধারায় দণ্ডিত করা হয়েছিল। তার মানে শ্রীদাশগুপ্ত, শ্রী দে এবং শ্রী ঘোষাল একবার একই অভিযোগে দণ্ডিত হয়েও সশস্ত্র বিপ্লব থেকে নিজেদের সরিয়ে নেননি। বিদ্রোহীরা মৃত্যুভয়ে নিজেদের বিদ্রোহীর জীবন থেকে দূরে ঠেলে রাখতে পারেন না।

হাইকোর্টে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত আসামীরা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেছিলেন। আপিলের শুনানীর সময় আসামী পক্ষ থেকে হাইকোর্টের কাছে বক্তব্য রাখা হয়েছিল একই অভিযোগে একই আসামীর বিরুদ্ধে দু-বার আলাদাভাবে বিচার হতে পারে না। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডদান করা আইনসঙ্গত নয়।

কলকাতা হাইকোর্ট অবশ্য আসামী পক্ষের এই বক্তব্য মেনে নিতে পারেননি। হাইকোর্ট বরং স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায় বহাল রেখেছিলেন।

তদানীন্তনকালে সশস্ত্র নারী বিপ্লবীর কথা ভাবা যেত না। তাই পারুল মুখার্জি টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আসায় সাধারণের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন হয়েছিল। বাঙালি সশস্ত্র নারী বিপ্লবীকে নিয়ে শোনা যাচ্ছিল নানা আলোচনা। বেশির ভাগ বাঙালি পরিবারে গর্বের ভাব লক্ষ্য করা যেত।

সত্যি সত্যি শ্রীমতী পারুল মুখার্জি ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী দলের গর্ব। ভাবা যায় বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ভারতীয় বাঙালি যুবতী সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যুক্ত হয়ে বিপ্লবী যুবকদের সাথে সমভাবে বিপ্লবী কাজকর্মে নিজেদের যুক্ত করতে পারেন?

অথচ বাস্তবে বেশ কয়েকটি যুবতী ও কিশোরী প্রাণের ডাকে এগিয়ে এসে সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে ক্রমাগত আন্দোলন করে গিয়েছিলেন। পারুল মুখার্জির মতো বিপ্লবী নারীরা আমাদের নমস্য।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট আপিলের উপসংহারে বলেছিলেন :—

"No doubt the house of Titagarh was the general head quarters of the conspiracy. Whether or not Purnananda lived there for the whole time or whether or not shyam Benode was there all the time makes no difference as they undoubtedly used it as the heart and centre of the conspiracy during the time it was occupied by Parul."

এই অংশটির ভাষা থেকে বোঝা যায় টিটাগড় গোয়ালপাড়ার আখড়াটির দায়দায়িত্ব ছিল শ্রমতী পারুল মুখার্জির ওপর। আখড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা ছিল এই নারী বিপ্লবীটির।

একজন যুবতীর পক্ষেও যে মানসিক শক্তি ও দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থাকলে যে কোনও কাজে সাহসী কাজে সংশ্লিষ্ট হওয়া যায়—শ্রমতী পারুল মুখার্জি তা প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন। এই সত্য প্রমাণ করলেও ক'জন জানেন শ্রীমতী পারুল মুখার্জিকে? কজনেই জানার চেষ্টা নিয়েছেন তাঁর বিপ্লবী জীবনের কাজকর্মের ইতিহাস? না সশস্ত্র বিপ্লবী নারীটির কথা আমরা জানার চেষ্টাও করিনি।

পরাধীন ভারতকে মুক্ত করে যে লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছবার কথা ছিল সেই লক্ষ্যে কী আমরা পৌঁছতে পেরেছি? যদি তা না পেরে থাকি তাহলে সশস্ত্র বিপ্লবীরা শুধু শুধু নিজেদের জীবন দেশের জন্য বলিদান করলেন কেন সেই কথা ভাবতেও কষ্ট হয়। নিজেদের ছোট মনে হয়।

শ্রীমতী পারুল মুখার্জির মতো যুবতীরা দেশের জন্য শুধু দিয়েই গেলেন। পেলেন না কিছুই। হয়ত পার্থিব কোন কিছু পেতে তাঁরা চাননি। অন্তত পক্ষে প্রাপ্য সম্মানটুকু পাওয়ার ইচ্ছা হয়ত মনে মনে তাদের থাকতেও পারে।

জীবনকে বাজি রেখে একটি নারী দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে গেলেন এবং পরবর্তী আমাদের কী উচিত ছিল মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত বীরাঙ্গনাদের কথা মনে রাখা? কালের প্রবাহে আমরা ফল পেলে ফলদাতার কথা ভুলে যাই। বড় বিচিত্র মনের গতি বোঝা দায়।

পারুল মুখার্জিদের মতো নারীরা ছিলেন চাওয়া পাওয়ার অনেক উর্ধ্বে। দেশের স্বার্থে, সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনাকে উপড়ে ফেলতে পারুল মুখার্জির মতো বিপ্লবীরা কিছু পেতে চাননি। ওদের কাছে ছিল মূল্যবোধ। যেটা আজ হারিয়ে গিয়েছে। আদর্শ না থাকলে মূল্যবোধ আসতে পারে না। আসেওনি।

নানা যুক্তি-তর্কের আলোচনা করে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট পণ্ডিত আসামীদের আপিল খারিজ করে দিয়েছিলেন ১৯৩৮ সালের ৯ই মে। দণ্ডিত আসমীদের জানাই ছিল রায়ের ফলাফল।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার আপিল শুনানির জন্য কলকাতা হাইকোর্ট আপিল বেঞ্চটি গঠিত হয়েছিল তিনজন মহামান্য বিচারপতিকে নিয়ে। এই তিনজন বিচারপতির মধ্যে ছিলেন মিঃ কাস্টলো, মিঃ জ্যাক এবং শ্রী এন সি ঘোষ।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমানবেন্দ্র রায় জার্মানি ও ইওরোপের অন্যান্য জায়গা থেকে ভাবতবর্ষের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের চিঠির মারফতে পথ নির্দেশ দিতেন, তিনি বিদেশে বাসকালে সশস্ত্র বিপ্লবকে ভিত্তি করে লিখেছিলেন একাধিক ইস্তাহার ও বই।

শ্রীমানবেন্দ্র রায়ের স্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী ইভলিন রায়। বিদেশিনী মহিলা ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব সম্বন্ধে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। স্বামীকে বিপ্লবী ইস্তাহার ও বই লেখার ব্যাপারে ভীষণভাবে প্রেরণা দিতেন ও যথাযথভাবে সাহায্য করতেন।

শ্রীমতী ইভলিন রায় নিজেই লিখেছিলেন অনেকগুলি বিপ্লবী বই, বইগুলি ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্বামী মানবেন্দ্র রায়ের সাথে যৌথভাবে শ্রীমতী ইভলিন রায় লিখেছিলেন "One year of Non Co-operation."

একজন ভারতীয়কে বিয়ে করে শ্রীমতী ইভলিন রায় ভারবতর্ষ থেকে বিদেশি সরকারকে হটাতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন।

পারুল মুখার্জির মতো সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও পরোক্ষভাবে বিদেশে বসে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীমতী ইভলিন রায়কেই বা ভুলি কি ভাবে। এদের সাহায্যও ছোট করে দেখা উচিত নয়।

বিপ্লবী সশস্ত্র যুবক-যুবতীর কথা লিখতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে—বিদ্রোহী কবি কী সশস্ত্র বিপ্লবীদের কথা মনে করেই লিখেছিলেন :—

ভোলাব মাঝে উঠব বেঁচে সেই তো আমার প্রাণ।
নাইবা পেলাম, চেয়ে গেলাম, গেয়ে গেলাম গান।

পারুল মুখার্জিব মতো বিপ্লবীরা বোধহয় স্বাধীনোত্তর ভারতবাসীর কথা বুঝতে পেরে কোন প্রত্যাশা না করেই স্বাধীনতার গান গেয়ে গিয়েছিলেন নির্ভিক চিত্তে। পারুল মুখার্জির মতো মেয়েদের পার্থিব কিছু পাওয়ার আশা-আকাঙক্ষা ছিল না। তাই বলে স্বাধীন ভারতবাসী তাঁদের স্মৃতির প্রতি প্রাপ্য সম্মানটুকু দেবেন না?

পারুল মুখার্জির মত প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র আন্দোলনে অনেক নারীই যোগ দিতে পারেননি তাই বলে বিপ্লবীদের প্রতি দেশের নারীদের সমর্থন ছিল না তা কিন্তু ঠিক নয। ১৯৩১ সালের ৯ জুলাই সিলেটের টাউন হলে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই সভায় সমবেত নারী-পুরুষ বিপ্লবীদের সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছিলেন সিলেট শহরেব মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ।

সিলেট শহর। শহরবাসীর কাছে শ্রীদ্বারকাথ গোস্বামী ছিলেন মান্যগণ্য নেতা। দ্বারকানাথ গোস্বামীর নেতৃত্বে ৪০ জন যুবক-যুবতী মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সিলেটের টাউন হলের দিকে। মিছিলে শামিল যুবক-যুবতীর হাতে ছিল কালো পতাকা।

মিছিলের সামনের দিকে কয়েকজন যুবক-যুবতীর হাতে ছিল সশস্ত্র বিপ্লবী শহিদ দীনেশ গুপ্ত ও ভগৎ সিংহের বড় ব্যানারের ছবি। মিছিলটি পৌঁছেছিল সিলেট শহরের টাউন হলে।

তদানীন্তকালে ব্রিটিশ প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে টাউন হলের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন প্রায় ২০০ জন মহিলা ও পুরুষ।

টাউন হলের সভাটি প্রমাণ করে সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি দেশবাসীর সমর্থন। সশস্ত্র বিপ্লবীরা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—Blood calls blood.'

তাহলে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। রক্তের বিনিময় ছাড়া কী অন্য পথে আসা স্বাধীনতা স্থায়ীভাবে দানা বাঁধতে পারে না। অভিজ্ঞতা তাই বলে।

যখন ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসন বুঝতে পারলেন—ভারতের যুবশক্তি দেশের পরাধীনতা মোচাতে একের পর এক সশস্ত্র বিপ্লবী দল গড়ছেন এবং তাদের মূল লক্ষ্য ইংরেজ কোতল করা তখন ইংরেজ প্রশাসকদের কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিতে শুরু করেছিল। দেখা যাচ্ছিল বেশ কয়েকটি বিপ্লবী দলে যুবকদের সাথে যুবতীরাও যোগদান করছিলেন তখন ব্রিটিশ প্রশাসন কৌশল নিয়েছিলেন হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া। যে কোন ভাবে হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে পারলে সশস্ত্র বিপ্লব কখনই দানা বাঁধতে পারবে না।

এই দুই সম্প্রদায়কে এক হতে দিলে ব্রিটিশ প্রশাসন দারুণভাবে সমস্যার সম্মুখীন হবেন। অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানকে যৌথভাবে কখনই প্রশাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে দেওয়া হবে না। কৌশলগত কারণে গোয়েন্দা বিভাগে পুলিসের মধ্য থেকে বিশ্বস্ত পুলিস অফিসার হিসেবে রাখা হয়েছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। সত্যি সত্যি মুসলমান অফিসাররা তাদের বিশ্বস্ততা দেখিয়ে ছিলেন। প্রশাসনের পক্ষে মুসলমান অফিসাররাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করেছিলেন। গুপ্ত খবরও তারাই সংগ্রহ করে ব্রিটিশ প্রশাসনের কর্ণগোচর করতেন।

বিপ্লবী দলগুলি অবশ্য ব্রিটিশ প্রশাসনের এই কৌশল ধরতে পেরেছিলেন। যথাসম্ভব এই ব্যাপারে সাবধানতাও অবলম্বন করেছিলেন। বিপ্লবী দল মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। তারা সবাই পরাধীন। পরাধীনতার থেকে দেশকে মুক্ত কবতে গেলে যৌথভাবে তাদের লড়াইয়ের মাঠে নামতে হবে।

অনেকভাবে বুঝিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুব বেশি টানা যায়নি বিপ্লবী দলে। অবশ্য কিছু শিক্ষিত মুসলমান যুবক সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে দেশের কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

তাঁরা বুঝেছিলেন ব্রিটিশ প্রশাসনের কৌশল। সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে দিতে পারলে কোন আন্দোলনই বিশেষ দানা বাঁধতে পারবে না—ব্রিটিশ প্রশাসন খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, তাই বেছে বেছে মুসলমান পুলিস অফিসারকে লাগানো হয়েছিল বিপ্লবী দলের বিরুদ্ধে। বিপ্লবী দলের হিন্দু, মুসলমান নেতৃত্ব ব্রিটিশ প্রশাসনের কৌশল বুঝতে পেরেও সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপড়ে ফেলতে পারেননি।

ব্রিটিশ প্রশাসনের সেই সাম্প্রদায়িকতার বীজটি আজও সমানে চলেছে। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে—সাম্প্রদায়িকতা কমে যাওয়া দূরে থাকুক ববং বেড়েছে।

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ না হলে কোন গণতান্ত্রিক দেশ বাড়তে পারে না। কাজের সময় বিদ্রোহী কবির একই বৃন্তের দুটি ফুল হিন্দু আর মুসলমান সেই কথা কিন্তু আমরা ভুলে যাই। আমাদের মধ্য থেকে সাম্প্রদায়িকতা নামক অভিশাপটির বিলোপ সাধন না করতে পারলে দেশের পরিকাঠামো ভেঙেপড়বে। ব্রিটিশের সৃষ্টি এই সাম্প্রদায়িকতা কঠোর ভাবে বন্ধ করতে হবে। বক্তৃতামঞ্চের বক্তব্যের মধ্যে তা যেন আবদ্ধ না থাকে।

প্রকৃত শিক্ষাই কেবলমাত্র বোঝাতে পারবে হিন্দু ও মুসলমান ভাই ভাই। দেশের সবাই সম নাগরিক।

'পুনরায় অরাজকতা' নিবন্ধটি ছিল বিদ্রূপাত্মক প্রয়াস। এইটি ছিল বাংলার গভর্নরের প্রতি একটি তীব্র প্রতিবাদ। সরকারের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল। নিবন্ধটিতে বলা হয়েছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার স্বার্থে হিন্দু মুসলমানকে দুই দিকে রেখে বিরোধ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। ব্রিটিশ প্রশাসন বুঝতে পেরেছিলেন দুই সম্প্রদায় যৌথভাবে সশস্ত্র আন্দোলনে শামিল হলে তাদের এই দেশ থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। তারা তাদের নীতিতে ঠিকই ছিলেন। এই নীতি চাপিয়ে দেওয়ায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বেড়েছিল এবং ভাল ফল পেয়েছিলেন তদানীন্তন সরকার। যৌথভাবেই কোনদিনই বিশেষ ভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করতে পারেননি সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলি।

হিন্দু, মুসলমান সবাই ভারতবাসী। সবাই পরাধীনতার গ্লানিতে ভুগছে এই অবস্থাটা ব্রিটিশ প্রশাসনের কৌশলে তা বিশেষ করে মুসলমানদের বুঝতে দেওয়া হয়নি। বিপ্লবী নেতৃত্বও সশস্ত্র বিপ্লবে মুসলমান যুবকদের খুব বেশি টানতে পারেননি।

ভারতের আমলাতান্ত্রিক ব্রিটিশ প্রশাসন জানতেন পার্লামেন্টে কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করলে তাদের নীতি রূপায়ণ করতে সুবিধা হবে। হিন্দু-মুলসমানদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে রাখতে পারলে পার্লামেন্টে কোন পক্ষই ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে খুব জোরের সাথে সোচ্চার হতে পারবে না।

এই সব দিক চিন্তাভাবনা করার ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসন বলেছিলেন—পাবনার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে যখন চরমতম সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই সময় 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা 'Anarchy in Pabna' নিবন্ধটি ছাপিয়ে জনরোষ সৃষ্টি করেছে সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে। নিবন্ধটি উস্কানিমূলক।

ব্রিটিশ প্রশাসনের এই উস্কানিমূলক কৌশল সত্ত্বেও পাবনা জেলায় সেই সময় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত করা প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উল্টে পাবনার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে জন্মেছিল দারুণ ঘৃণা।

পাবনা জেলায় যা পারা যায়নি, অন্য জেলায় কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা।

স্বাধীনতার এত বছর বাদেও কেন সমাজদেহ থেকে সাম্প্রদায়িকতা নামক বিষটিকে সরানো গেল না।

ভারতীয় সংবিধানকে কলুষিত করেছে সাম্প্রদায়িকতা।

বাঙালি নারী দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে যেখানে নিজের জীবন দিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ করেননি সেখানে সাম্প্রদায়িকতা নামক একটি বীজ বপন করার হিন্দু-মুসলমানকে এক হতে দেয়নি ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসন। সেই জিনিস এখনও চলছে।

।। তিন ।।

সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের কথা লিখতে বসে অনেক কথাই এসে যায়। তাই পরাধীন ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের কিছু কিছু ঘটনা তুলে ধরতে হয়েছে।

কিছুদিন আগে "যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই" নামে একটি বই হাতে আসায় বেশ মন নিয়ে পড়েছিলাম। বইটির লেখিকা বেশ কিছু ঘটনার কথা তুলে ধরেছেন বইটিতে। বেশ কয়েকটি যুবতীর কথা তুলে ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন ইতিহাসের পাতায় সেই সব মেয়েদের কথা হয়ত কোনদিন স্থান পাবে না। অথচ পরাধীন ভারতে বিপ্লবী দলের যুক্ত না হয়েও ওরা বিপ্লবীদের কি ভাবে সাহায্য করেছিলেন তা আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে। ভাল লেগেছিল পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য কবা কয়েকটি যুবতীর কথা জেনে। বইটির লেখিকা বেশ কয়েকটি যুবতীর কথা তুলে ধরেছেন স্বল্প পরিসরে।

বইটির ভূমিকায় শ্রীমতী ইনা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন--আজকের প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা স্বতঃসিদ্ধ আবিষ্কার। পূর্বকালের অবস্থার সাথে তাদের পরিচয় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষীণ।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে প্রাক-স্বাধীনতাকালে দেশের মানুষের কাছে একটি বড় লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। সন্ত্রাসবাদের পথ ঠিক ছিল কি না এই প্রশ্ন সামনে থাকলেও এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সে পথের পথিকদের জীবনে মূল্যবোধ, তাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সর্বোপরি দেশপ্রেম প্রশ্নাতীত ছিল।

সত্যিই তো দেশপ্রেম না থাকলে সন্ত্রাসবাদের একনিষ্ঠ পূজারীদের কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারে। প্রতি মুহূর্তে ছিল জীবনের ঝুঁকি। তবুও সাধারণ ঘরের মেয়েরা গুপ্তভাবে পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিলেন অসমসাহসী যুবতীরা। এমন কী অনেক সময় বাড়ির লোকও জানতে পারেননি তাঁদের বাড়ির যুবতীর সাথে বিপ্লবী দলের সদস্যদের সংশ্লিষ্ট থাকার কথা।

দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের মধ্যে ছিল আত্মবিসর্জনের অঙ্গীকার। আবারও অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতেই হচ্ছে তদানীন্তনকালের সশস্ত্র বিপ্লবী যুবক-যুবতীর আত্মবিসর্জনের অঙ্গীকারের সম্মানটুকু পর্যন্ত ভুলে যেতে বসেছেন এই প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী নারীদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করলে বহু অনামী নারীকে নাম পাওয়া যাবে। জানা যাবে তাদের ভূমিকা।

পারুল মুখার্জি, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বা উজ্জ্বলা মজুমদারের কথা কিছু কিছু লোক জানলেও আরতির কথা জানার সুযোগ ছিল না সাধারণ মানুষের।

আরতিদেবী ছিলেন ছোটবাবুর বিবাহিতা যুবতী স্ত্রী, সম্পর্কে ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী অলোকের বোনের জা। আরতির স্বামীকে চা বাগানে সবাই ছোটবাবু ডাকতেন। আরতি ছিলেন নিঃসন্তান। এই চা বাগানটি ছিল চট্টগ্রামের অরণ্য অঞ্চলে। সভ্যজগৎ থেকে বাগানটির অবস্থান বেশ দূরে।

কোয়ার্টারের দরজায় খুব ভোরে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন আরতি। দরজা খুলে হঠাৎ অলোককে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন আরতিদেবী। আরতি চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবীদের কথা শুনলেও বিপ্লবীদেব সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

অলোকের অবসন্ন দেহ দেখে আরতিদেবী নিজে তাকে ধরে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন। অবসন্ন দেহ নিয়েও অলোক কোন রকমে প্রণাম করেছিল আরতিদেবীকে। এর পরেই বিপ্লবী যুবকটি অচৈতন্য হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে আরতির পক্ষে কিছুই বোঝা সম্ভব ছিল না।

আরতিদেবী অলোকের অচৈতন্য অবস্থায় সুস্থির থাকতে না পেরে ছোটবাবুকে চা বাগানের ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন নিজের চা বাগানের কোয়ার্টারে। ডাক্তারবাবু অলোককে পরীক্ষা করে দেখলেন—কিশোরটির নবীন দেহে গুলির আঘাত। ডাক্তারবাবুর অলোকের কাঁধে গুলির আঘাতটি দেখে মনে হয়েছিল—দিন চার-পাঁচ আগে কিশোরটির কাঁধে গুলি লেগেছিল। ফলে আঘাতের জায়গাটির মাংস পচে উঠেছে।

অলোক অচৈতন্য অবস্থায় থাকার জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোন সুযোগ পাওয়া গেল না কি ভাবে তার দেহে গুলি লেগেছে। আরতিদেবী অলোকের সেবাশুশ্রূষা করে তাকে খানিকটা সুস্থ করে তুললেন। আরতি দেবী কিশোরটির জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। সাতদিন বাদে বাদে চা বাগানটিতে পৌঁছায় সংবাদপত্র। সাতদিন বাদে চা বাগানের লোকজন জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের দ্বারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কথা জানতে পারলেন। ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন—পলাতক অলোকের সন্ধান দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে সন্ধানকারীকে। যে অলোকের জন্য পুলিস হন্যে হয়ে ঘুরছে, সেই অলোক তখন চা বাগানে আরতিদেবীর কোয়ার্টারে শয্যাশায়ী। অলোকের তখন বয়স হবে প্রায় আঠারো। আরতিদেবী সংবাদপত্রের খবর পড়ে সবই বুঝতে পেরেছিলেন। আরতিদেবীর স্বামী ছোটবাবুরও কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ছোটবাবু প্রমাদ গুনলেন। সরকারি কর্মচারীর বাড়িতে অলোকের মত সশস্ত্র বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছেন জানতে পারলে ব্রিটিশ প্রশাসন তাঁকে বাঁচতে দেবেন না।

ছোটবাবু তাঁর ভয়ের কথা জানালেন স্ত্রী আরতিদেবীকে। আরতিদেবী তাঁর স্বামীকে অনুনয়ের সাথে বললেন—এই জঙ্গলে আহত অলোকের কথা কেউ জানতে পারবে না। তিনি অলোকের অবস্থান কারোকে জানতে দেবেন না। একটু সুস্থ হলেই অলোককে তিনি অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। এই শারীরিক অবস্থায় তিনি অলোককে ফেলে দিতে পারবেন না নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য।

যে কোন ভাবেই হোক ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিস খবর পেয়ে গিয়েছিল অলোকের। পুলিস রওনা দিয়েছিল অলোকের সন্ধানে। ছোটবাবুও জানতে পেরেছিলেন পুলিসের যাত্রার কথা। ছোটোবাবু বুঝতে পেরেছিলেন পুলিস এসে তার কোয়ার্টারে অলোককে পেলে তার রক্ষা থাকবে না। শেষরাতে হাটের মাঝে একটি পরিত্যক্ত ঘরে রেখে গিয়েছিলেন ছোটবাবু আহত অলোককে। অলোকের গলা থেকে একবার মাত্র শোনা গিয়েছিল—'মা-মাগো'।

অলোককে ওই অবস্থায় হাটের মাঝে রেখে আসায় আরতিদেবী কেঁদে ভাসাচ্ছিলেন। ছোটবাবু আরতিকে বলেছিলেন—পুলিস তল্লাশি করে চলে যাওয়ার পর তিনি অলোককে আবার কোয়ার্টারে নিয়ে আসবেন।

তার আর হল না। অলোককে পুলিস গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু অচৈতন্য অলোককে পুলিসের পক্ষে ওই অবস্থায় শহরে আনা সম্ভব না হওয়ায় তাকে চা বাগানের হাসপাতালের রাখা হল। পুলিসের গার্ড ছিল চা বাগানের হাসপাতালে।

পরে ভালভাবে জানা গেল জালালাবাদ পাহাড়ে শিক্ষিত সৈনিকের মত অলোক পুলিসের সাথে লড়াই করেছিল মাস্টারদার নেতৃত্বে।

গুলির আঘাত খেয়ে কখন যে সে পাহাড় থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিল তা সে নিজেও জানে না। ভাবতেও কষ্ট লাগে— হাসপাতালেই মারা গিয়েছিল চট্টগ্রাম রেভলিউশনারী আর্মির বীর সৈনিক অলোক নামক কিশোরটির। নদীর পারেই অলোকের চিতাশয্যা সাজানো হয়েছিল।

নারী হয়েও আরতি বাড়িতে সময় কাটাতে পরছিলেন না। অলোকের চিতাশয্যা দেখতে গিয়েছিলেন আরতিদেবী। সুযোগ ও সাহস তার কম। তাই অলোকের মত যুদ্ধ করে দেশের জন্য তিনি জীবন বিসর্জন দিতে পারেননি। অথচ জঙ্গলে থেকেও আরতি বিপ্লবীদের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। নিজের মনের জোরে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবীদের সমর্থন করতেন। অলোকের মৃত্যু আরতিকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল।

অলোককে দাহ করার পর যখন সবাই নির্দিষ্ট চিতার স্থানটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন—তখন আরতি একরাশ ফুল ছড়িয়ে দিলেন অলোকের চিতাশয্যার ওপর। সঙ্গে সেখানে পড়ল দু ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। আরতির চোখের জল। আরতি বোধহয় কোনদিনই ভুলতে পারেনি কিশোর বিপ্লবী অলোকের কথা।

আরতির নিজেরও ছিল পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের ওপর অগ্নিরোষ। অথচ তাঁর মতে নারীর পক্ষে বিপ্লবী দলে মিশে লড়াই করা সম্ভব ছিল না। ইচ্ছা ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না। তাই আরতি হতে পারেননি প্রীতিলতা বা কল্পনা। আরতিদেবীর মত নারীদের কিন্তু কেউ জানল না।

অথচ আরতিদের মত নারীদের ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে কি ভোলা যায়। আলোককে যেমনি ভোলা যায় না। তেমনি আরতিকেও ভোলা যায় না।

আরতি দেবীর কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল প্রমীলাদেবীর কথা। প্রমীলা দেবী ছিলেন জজসাহেবের আদরের কন্যা। প্রমীলা দেবী জজসাহেবের মেয়ে হয়েও সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিলেন মনের জোরে। প্রমীলা বা আরতির মত অনেক যুবতী ভয়, অপবাদ, লজ্জা এবং ভবিষ্যত সব কিছুকে উপেক্ষা করে সশস্ত্র বিপ্লবীদের নানা ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল গুপ্তভাবে। এই সব সাহায্যকারী নারীরা নিজেদের নাম-যশের কথা কখনই ভাবেননি।

তাঁদের ভাবনা ছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করে যারা সশস্ত্র বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁদের যথাসম্ভব সাহায্য করা।

তখন চলছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ব্রিটিশের প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে নেতারা যখন প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে, তখন সমগ্র বঙ্গদেশে দেখা দিয়েছিল প্রবল উত্তেজনা।

বাংলার ঘবে ঘরে বিক্ষোভের মনোভাব জাগ্রত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। মনের দিক থেকে দেশের সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারছিলেন না বাংলার এই বিভাজন। বিক্ষোভের ঢেউ ছুঁয়ে গিয়েছিল বাংলার বহু শিক্ষিত যুবতী ও কিশোরীর মন।

প্রমীলার কথায় আবার ফিরে আসা যাক। বিক্ষোভের আগুন জ্বলেছিল যুবতী প্রমীলার মনেও। সশস্ত্র বিপ্লবী নেতাদের অনুগামী হয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য প্রমীলা দেবীরও উৎসাহের অভাব ছিল না। কিন্তু প্রকাশ্যে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাহায্য করার কোন উপায় ছিল না প্রমীলা দেবীর পক্ষে। প্রকাশ্যে কিছু করতে না পারার জন্য সজ্জিত হচ্ছিলেন প্রমীলা নামক যুবতীটি। এই সময় প্রমীলার সাথে যোগাযোগ হিয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবী নিরঞ্জনের। নিরঞ্জন একটি জনহীন জায়গায় থেকে এসে প্রমীলা দেবীকে বলেছিলেন—

—প্রমীলা উৎপল নামক একটি যুবককে তোমায় আশ্রয় দিতে হবে।

—আমি একটি যুবককে আশ্রয় দেব?

—হ্যাঁ। তার কিছুদিনের জন্য আশ্রয় বিশেষ প্রয়োজন। যে ভাবে পার—ব্যবস্থা কর।

প্রমীলা বুঝতে পেরেছিলেন নিরঞ্জনদা যখন নির্দেশ দিয়েছেন—যে ভাবেই হোক তাঁকে কাজটি করতে হবে। অথচ কী ভাবে এই সাংঘাতিক নির্দেশ একটি যুবতীর পক্ষে পালন করা সম্ভব!

নিরঞ্জনদাই তার মাথায় পরিকল্পনাটি ঢুকিয়েছিলেন। প্রমীলা দেবী উৎপলকে চাকর হিসেবে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

একদিন খুব ভোরে চাকর উৎপলের কণ্ঠে গীতার শ্লোক শুনতে পেয়েছিলেন প্রমীলা দেবীর জজসাহেব বাবা। জজসাহেব মানুষ। তাঁর পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয়নি উৎপল চাকর হিসেবে বাড়িতে ঢুকলেও সে মোটেই সাধারণ ছেলে নয়।

প্রমীলা বুঝতে পেরেছিলেন জজসাহেব বাবার চোখে উৎপল ধরা পড়ে গিয়েছে।

উৎপলকে ডেকে প্রমীলা তাকে বলে দিয়েছিলেন—উৎপলের সাবধান হওয়া উচিত। তাঁর বাবার মনে উৎপল সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যে কোন সময় বিপদ আসতে পারে। উৎপল বুদ্ধিমান যুবক। সেও বুঝে গিয়েছিল প্রমীলাদের বাড়িতে তার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ একদিন গভীর রাতে প্রমীলার শোবার ঘরে এসে ঢুকেছিল সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্য উৎপল নামক যুবকটি। প্রমীলার ঘাড়ের কাছে তার মুখ। এত রাতে উৎপলকে তার শয়নকক্ষে দেখে প্রমীলা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুটা ভয়ও পেয়েছিলেন।

উৎপল প্রমীলার কানে কানে বলেছিল তাকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। তাকে বিশেষ একটি সংবাদ দেওয়ার জন্য গভীর রাতে তার প্রমীলার শয়নকক্ষে আগমন।

—কী সংবাদ?

—কাল সকালেই পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করতে প্রমীলাদের বাড়ি আসবে।

—তুমি এই খবর জানলে কী ভাবে?

—আমরা বিপ্লবী। অনেক কিছুই জানতে পারি। আমাদের জানতে পারা খবরে বিশেষ ভুল থাকে না।

—তবে—এখন উপায়?

—আমি এখনই পালাচ্ছি। রিভলভার দুটি রইল। লুকিয়ে রেখ। পরে সুযোগমত নিয়ে যাব।

—যদি ধরা পড়?

—ফাঁসি হবে।

উৎপল আর কথা না বাড়িয়ে প্রমীলাদের বাড়ি থেকে সেই গভীর রাতে চলে গিয়েছিল। কয়েকদিন বাদেই প্রমীলা জানতে পেরেছিলেন উৎপল ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে। আরো কিছুদিন বাদে প্রমীলার কানে সংবাদ পৌঁছেছিল বিচারে উৎপলের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। উৎপলকে দণ্ডিত হওয়ার পর যেতে হয়েছিল আন্দামানে।

বেশ কিছুদিন বাদে আন্দামান থেকে উৎপলের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন প্রমীলাদেবী। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন প্রমলা দেবী উৎপলের চিঠিটি পেয়ে।

পত্রের লেখক একজন দণ্ডিত আসামী হলেও উৎপল তার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন তাকে বিপদের দিনে আশ্রয় দেওয়ায়। তবে কী উৎপল মনে মনে ভালবেসেছিল প্রমীলাকে। সশস্ত্র বিপ্লবীরা কী ভালবাসতে পারে কোন মেয়েকে এই প্রশ্ন প্রমীলার মনে জন্ম নিয়েছিল উৎপলের লেখা চিঠিটি পেয়ে।

প্রমীলা অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন বাহ্যিক প্রকাশ না থাকলেও বিপ্লবীদের মনেও থাকে প্রেম-ভালবাসা। উৎপলের রেখে যাওয়া রিভলভার দুটি সশস্ত্র বিপ্লবী দলকে ফেরত দিয়েছিলেন প্রমীলা সশস্ত্র বিপ্লবে কাজে লাগাবার জন্য। পুলিস প্রমীলার এই গুপ্ত কাজ কোনদিন জানতে পারেনি।

শ্যামলী নামে স্কটিশে পড়া ছাত্রীটি যেন একসময় নিজের অজান্তেই

মিশে গিয়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাথে। বিপ্লবী সুপ্রকাশ গন্তব্যস্থল না জানিয়ে শ্যামলীকে নিয়ে এসেছিলেন নৈহাটির বিপ্লবী আখড়ায়। নৈহাটি রেল স্টেশনে নেমে শ্যামলীর হাতে একটি সুটকেশ ধরিয়ে দিয়েছিলেন সুপ্রকাশ।

—দাদা এই সুটকেসে কী আছে?

—পরে জানতে পারবে। এখন কোন প্রশ্ন কোরো না।

বিপ্লবী ডেরায় এসে শ্যামলী দেখতে পেয়েছিল তার প্রণম্য এক সশস্ত্র বিপ্লবী দাদাকে। তাঁকে দেখে শ্যামলী বলেছিলেন—-দাদা আপনাকে মনে হচ্ছে "সব্যসাচী"।

—না! না! তোমার এই দাদাটি একজন সামান্য মানুষ।

এর পরই তিনি শ্যামলীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার জিনিস এনেছ?

—মানে এই সুটকেসটি?

—হ্যাঁ!

সুটকেশটি খুলে দুটি মোড়ক বার করা হয়েছিল। মোড়ক দুটি খুলে দেখা গেল একটির মধ্যে রয়েছে একটি ফিজিক্স বই। বইটির পাতা খুলতেই শ্যামলী চমকে গিয়েছিলেন। ফিজিক্স বইটির মাঝখানে আগাগোড়া পাতা কেটে একটি খোপ তৈরি করা হয়েছে। সেই খোপের মধ্যে অতি যত্নসহকারে রাখা ছিল একটি 'বোমা'।

অপর মোড়কটি খুলতেই দেখা গিয়েছিল একই পদ্ধতিতে অপর একটি বইয়ের পাতা কেটে খোপ বানিয়ে রাখা হয়েছে একটি পিস্তল।

বোমা ও পিস্তল দেখে শ্যামলী হত চকিতভাবে সেই দাদাটিকে বলেছিলেন—

—এই আপনার সম্পত্তি?

—হ্যাঁ! বোন। তোমার হাত নিয়ে নিরুপায় হয়ে দিতে হয়েছিল সুটকেসটি। যদি তোমার কাছে সুটকেসটি বেশিদিন রাখা হত তাহলে তোমার বিপদ ঘটতে পারত। তাই এই পদ্ধতিতে তোমাকে দিয়েই সুটকেসটি এই ডেরায় নিয়ে আসতে হল।

আশাকরি তুমি আমাদের ক্ষমা করবে।

শ্যামলী লজ্জা পেয়েছিল শ্রদ্ধেয় সশস্ত্র নেতাটির কথায়। প্রমীলা উৎপলের চিঠি পড়ে বুঝেছিল—সশস্ত্র বিপ্লবীদের সুপ্ত মনেও নিজস্ব কামনা, লালসা, প্রেম, ভালবাসা লুকিয়ে থাকে। নিজস্ব স্বার্থের থেকে তাদের কাছে অনেক অনেক বড়ো দেশের সমগ্র মানুষের স্বাধীনতা। তাঁরা মুক্তিমন্ত্রের পূজাবী। ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁদের দেখতে নেই।

শ্যামলী আবার ফিরে এসেছিল কলেজ হোস্টেলে। কলেজ হোস্টেলে এসে শ্যামলী জানতে পেরেছিল তার অবর্তমানে পুলিস এসে হোস্টেল ও তার ঘর তল্লাশি করে গিয়েছে। বেশিরভাগ হোস্টেলেব মেয়েই হোস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছে। পুলিস মেয়েদের হোস্টেল তল্লাশি করায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা শ্যামলীর সাথে বিপ্লবী দলেব সদস্যদের যোগাযোগের কোন কথাই জানত না।

এর কিছুদিনের মধ্যে সকলের অজান্তে শ্যামলী নিজেও স্কটিশ কলেজের হোস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। শ্যামলী ফিরে এসেছিলেন দেশের বাড়িতে মা-বাবার কাছে। লেখাপড়ার পর্ব চুকে গিয়েছিল শ্যামলীর কলেজে হোস্টেল ছাড়াব পর থেকে। শ্যামলী বাড়ি ফিরে এসে পড়ার থেকে তাঁর বিয়ের জন্য মা-বাবা উঠেপড়ে লাগতেই হঠাৎ একদিন শ্যামলী বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। শ্যামলীর কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না।

একদিন গভীর রাতে সি-আই-ডি পুলিস অফিসার কালীমোহন ঘোষের মৃত্যু ঘটেছিল কোন অজানা বিপ্লবীর গুলিতে। পরে জানা গিয়েছিল শ্যামলী নিজেই রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে পুলিস অফিসারটিকে হত্যা করেছিলেন। অনেকেই নাকি দেখেছিলেন শ্যামলীর পরনে ছিল খাকি ফুলপ্যান্ট, শার্ট ও মাথায় টুপি। অনেকেই পরে বলেছিলেন শ্যামলী দেবী ছিলেন পিওনের পোশাকে। পিওনটি নাকি সাধারণ উদাসীনভাবে সাইকেল চালিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

শ্যামলী এসে পৌছেছিলেন নির্দিষ্ট ডেরায়। শ্যামলী ফিরে আসার পর তাঁর বিপ্লবী বন্ধুরা শ্যামলীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—'কাজ হয়েছে?'। শ্যামলী কাঁধ নাড়িয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—'হয়েছে'।

শ্যামলী ওদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে একা একা অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। কেবলই শ্যামলী ভাবছিলেন—'আমি মানুষ খুন করলাম'।

প্রশান্ত স্বভাবের মৃদুভাষী দাদাটি শুধু শ্যামলীকে বলেছিলেন—'বোন তুমি মানুষ খুন করেছ কে বললে? তুমি শুধু একটি কাঁটা তুলে ফেলেছ দেশের মুক্তি আন্দোলনে। যাকে আজ তুমি খুন করেছ সে মানুষ নয়। তুমি খুন করেছ মানুষের চেহারায় ব্রিটিশ প্রশাসনের একটি বিশ্বাসী কুকুরকে। আমাদের কাছে তোমাব এই কাজ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তুমি কোন দোষ কবনি।'

এই সব কথাবার্তা যখন চলছিল, সেই সময অল্প বয়সেব ছেলে এসে বিপ্লবী ডেরায় খবর দিয়েছিল-- পুলিস সব খবর পেয়ে গিয়েছে। এখনই তাদের গ্রেপ্তার করতে আসবে। হাতে সময় ছিল না। রিভলভার ও কার্তুজ নিযে অপ্রযোজনীয জিনিসপত্র ফেলে রেখে শ্যামলীকে সঙ্গে নিয়ে ডেরা ছেড়ে বিপ্লবী দলের সদস্যারা অতি দ্রুত বেরিয়ে পডেছিলেন।

কয়েকদিন অনাহারের পর যখন বিপ্লবীরা একদিন খেতে বসেছিলেন—বাইরের থেকে কাদের যেন পদশব্দ শোনা গেল। বিপ্লবীরা বুঝতে পেরেছিলেন কাদের পদশব্দ।

শ্যামলী তাঁর বিপ্লবী দাদাটিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—দাদা, আপনি পিছন দিযে পালিয়ে যান। অনেক বিপ্লবী আপনার মুখ চেয়ে বসে আছেন। আপনাকে গ্রেপ্তার করলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। দল নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি সময় নষ্ট না করে পালিয়ে যান দাদা। আমাব জন্য ভাববেন না।

শ্যামলীর অনুরোধে বিপ্লবী নেতাটি পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। পুলিসের সাথে সেদিন লড়াই করেছিল শ্যামলী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। শ্যামলীর পিস্তলের গুলি ফুরিয়ে এসেছিল।

শেষ গুলিটি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই পুলিস এগিয়ে এসেছিল শ্যামলীর হাতে হাতকড়া পরানোর জন্য। পুলিস এগিয়ে আসতেই হাতের মুঠোর মধ্য থেকে কি যেন বের করে শ্যামলী মুখে টপ করে পুরে ফেলেছিলেন। পরে বোঝা গিয়েছিল পুলিসের হাত থেকে গ্রেপ্তার এড়াতে সায়ানাইডের পুরিয়া মুখে দিয়েছেন। এককালের স্কটিশের ছাত্রী শ্যামলী মৃত্যুর কোলে ঢলে

পড়েছিলেন। এই অবস্থায় পুলিস অফিসাররা কিছু বলতে পারছিলেন না। শুধু নির্বাক হয়ে শ্যামলীর মৃত মুখটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

গুপ্ত খবর পেয়েও পুলিসের পক্ষে শ্যামলীকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হল না। কে জানে আজ শ্যামলীর মত শিক্ষিত যুবতীর কথা। যিনি ভবিষ্যতের স্বপ্ন উড়িয়ে দিয়ে দেশের জন্য নীরবে নিভৃতে নিজের জীবন বলিদান করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। অনুসন্ধান করলে হয়ত আরো শ্যামলীর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। হয়ত খোঁজও হবে না—সব শ্যামলীদের পাওয়াও যাবে না। শ্যামলীরা দেশের গর্ব। কেউ জানুকে বা না জানুক।

পুলিস অফিসাররা যাঁরা শ্যামলীদের গ্রেপ্তার করতে এসেছিলেন—শ্যামলীর মৃতদেহ দেখে তাঁরা কি ভাবেননি—কি সাংঘাতিক মেয়ে! দেশের মুক্তির জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পর্যন্ত ভয় পান না। এদের জীবনের কি কোন ভয় ভীতি ছিল না?

প্রীতিলতাকে অনেকে জানলেও শ্যামলীকে প্রায় কেউ জানলই না। কিন্তু শ্যামলীকে গ্রেপ্তার করতে আসা পুলিস অফিসারদের মধ্যে শ্যামলীর এত সহজ মৃত্যুকে দেখে কেউ কেউ পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখের জল মুছেছিলেন।

পুলিস অফিসারদের মধ্যে হয়ত মনে মনে অনেকেরই সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি একটা সমর্থন ছিল। কিন্তু তা প্রকাশ করার মত অবস্থা ও মনের জোর তাদের ছিল না। অবশ্য পুলিসে চাকরি করে তা থাকাটাই স্বাভাবিক।

।। চার ।।

আরতি, প্রমীলা ও শ্যামলীর কথা বললেও সুজাতার কথা বলা হয়নি। অমল মিত্র নামে একটি সশস্ত্র দলের বিপ্লবী মনে মনে ভালবাসতেন সুজাতাকে। অমল নিজে ভালভাবেই জানতেন বিপ্লবীদের আন্দোলনের সময় অন্তত কোন মেয়েকে ভালবাসতে নেই।

একদিন অমল সুজাতার কাছে এসে বললেন—চললাম সুজাতা। আমাদের জীবন অনিশ্চয়তায় ভরা। আবার ফিরে আসব কি না জানি না।

সুজাতা সশস্ত্র বিপ্লবীটিকে কোন বাধা না দিয়ে শুধু বলেছিলেন—'দাঁড়ান'। অমল সুজাতার কথায় দাঁড়াতে সুজাতা অমলের পদধূলি নিয়েছিলেন। অমলকে উদ্দেশ করে সুজাতা বলেছিলেন—নারী হওয়া সত্ত্বেও সংসারের বন্ধুর পথকে আমরা সব সময় ভয় করি না। অমল সুজাতার কথার উত্তর দেওয়ার আগেই সে চলে গিয়েছিল স্থানটি ছেড়ে।

চারিদিকে শুরু হয়েছিল ধরপাকড়। অমলকে একদিন পুলিস গ্রেপ্তার করেছিল। বিচারে অমলের কারাদণ্ড হয়েছিল।

অমল মিত্র জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে বাস করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। একটা অবসাদ এসেছিল তার মধ্যে। অসুস্থতার কারণে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেওয়া অমলকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অমলকে যখন মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তখন অমলের দুটো চোখই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অমল মিত্র কিছুই দেখতে পেতেন না।

হঠাৎ কে যেন অন্ধ অমল মিত্রের পায়ের ওপর এসে পড়েছিল। অমল মিত্র প্রশ্ন করেছিলেন—কে তুমি?

সুজাতা উত্তরে বলেছিলেন তোমার মুক্তির খবর পেয়ে তোমাকে নিতে এসেছি। গাড়ি সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

—আমি অন্ধ সুজাতা।

—তাই তো তোমার পাশে একজনের দরকার।

—সুজাতা............

—বল?

—তুমি কী বলতে চাইছ?

—সেবার প্রয়োজনে বলেই আমাকেই থাকতেই হবে তোমার পাশে।

— বুঝে বলছ?

-আমি আর আজ যুবতী নই। বয়েস হয়েছে। যা বলছি বুঝে সুঝেই বলছি।

সুজাতা গ্রহণ করেছিল অন্ধ অমল মিত্রকে জীবন সঙ্গী হিসেবে। সুজাতার মত নারীরা অনেকেই সশস্ত্র বিপ্লবীকে মন থেকে শ্রদ্ধা করত। ভালবাসত।

পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে সভাসমিতিতে একজন বয়স্কা নারী একজন অন্ধ পুরুষকে নিয়ে এসে জায়গা করে বসতে। সভাসমিতিতে বক্তৃতা মন দিয়ে শুনতে।

সুজাতা দেবী ছিলেন একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সুজাতার আয়ে অমল আর সুজাতার চলে যেত, অমল যখন জেলে ছিল সুজাতা তার খবর রাখতেন। অমলের জন্যই সুজাতা বিয়ে না করে বসেছিলেন। একেই বোধ হয় বলা হয় সুপ্ত প্রেম।

সশস্ত্র বিপ্লবে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও এই বিপ্লবের সমর্থনকারী একজন নারী হিসেবে সুজাতাকে কি ভোলা যায়?

সুজাতার মত নারীরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে গিয়ে নিজেদের স্বাদ-আহ্লাদ বিসর্জন নিয়েছিলেন। অগ্নিযুগে সশস্ত্র বিপ্লবীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সুজাতারা।

অগ্নিযুগ নিয়ে বোধ হয় আমাদের আরো ভালভাবে গবেষণা করা উচিত। এখনও তা সম্ভব। ওঁরা তো কিছুই পাননি। পেতেও চাননি। ওদের স্মৃতি রোমন্থন করতে অপরাধ কোথায়!

স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারীদের কথা বলতে গিয়ে যেমন প্রীতিলতা, কল্পনা, পারুল ও উজ্জ্বলার পাশে কেমনভাবে যেন উঠে এল আরতি, প্রমীলা, শ্যামলী ও সুজাতার নাম।

প্রায় প্রত্যেকেরই জানা আছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবের পুরোধা ছিল বাংলা ও পাঞ্জাব। ক্রমশই সেই বিপ্লব ছড়িয়ে গিয়েছিল উত্তরপ্রদেশ, লাহোর, দিল্লি প্রভৃতি প্রদেশে।

কিন্তু সশস্ত্র আন্দোলনে বাংলার মেয়েরা যে ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেইভাবে কিন্তু ভারতের অন্য প্রদেশের মেয়েদের পাওয়া যায়নি। হয়ত পর্দার আড়ালে বিভিন্ন স্থানের নারীরা সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাহায্য করে থাকবেন।

আরতি, প্রমীলা, শ্যামলী ও সুজাতাদের কথা না হয় বাদই দিলাম— বর্তমান প্রজন্ম ভুলতে বসেছে প্রীতিলতা, পারুল, কল্পনা ও উজ্জ্বলাকে পর্যন্ত।

যদিও বলা হয় অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত স্বাধীনতা অর্জন কবেছে। কথাটা হয়ত সর্বতোভাবে অধিক নয়। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলি পরাধীন ভারতবর্ষের বিদেশি সরকারকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন।

ইংরেজ সরকার বুঝতে পেরেছিল এই ভয়লেশহীন যুবক-যুবতীদের বেশিদিন ঠেকিয়ে বাখা যাবে না। সম্ভবত ব্রিটিশ সবকার গভীরভাবে চিন্তা করেছিল সশস্ত্র আন্দোলন এবং অহিংস আন্দোলনের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দিলে ব্রিটিশ সরকারের প্রভাব বেশি থাকবে। ইংবেজ প্রশাসনের কাছে শুধু ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওযার ব্যাপারটিই মুখ্য ছিল না। ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়াব সাথে সাথে তাদের মৃত্যুভয়ও ছিল।

অহিংস মন্ত্রের নেতৃত্ব পর্যন্ত তাঁদের পত্র-পত্রিকায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাহসিকতার প্রশংসা করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের নেতৃত্ব কিন্তু কিছু কিছু সশস্ত্র বিপ্লবী দলের নেতাকে সম্মান দিয়েছিলেন। নানা জায়গায় কিছু নেতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিছু কিছু রাস্তার নাম পাল্টে তাদের নামকরণ করা হয়েছে।

যাহোক, এবার চট্টগ্রাম পাহাড়তলি রেলওয়ে ক্লাবে সশস্ত্র বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করা যাক।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে কেবল মাত্র অংশগ্রহণ করেছিলেন দলের যুবকরা। প্রীতিলতা ও কল্পনা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে ছিলেন না।

অনেক সাধারণ মানুষের একটা ভুল ধারণা আছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে প্রীতিলতা ও কল্পনা মাস্টারদার নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রীতিলতা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শহরতলি অপারেশনে। এইখানেই পুলিসের গ্রেপ্তার এড়াতে পকেট থেকে পটাশিয়াম সায়ানাইডের পুরিয়া বার করে মুখে পুরে দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

।। পাঁচ ।।

অনেকেরই জানা আছে চট্টগ্রাম বিপাব্লিকান আর্মির কর্ণধার ছিলেন বিপ্লবী সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদা। চট্টগ্রামের এই বিপ্লবী দলটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শ্রীসূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বে। বিপ্লবী দলটির সভ্যদের কাছে তিনি ছিলেন "মাস্টারদা"।

চট্টগ্রামের ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির পরিচালনায় ও মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানটি হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল। এই অভিযানটির চট্টগ্রাম রিপাব্লিকান আর্মির পক্ষ থেকে একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজিতে। ইস্তারটিতে বলা হয়েছিল—

"THE INDIAN REPUBLICAN ARMY further declares that any person who will produce any Englishman, woman or child of any age to its headquarters, dead or alive, will be amply rewarded.

INDIAN REPUBLICAN ARMY

Chittagang Branch."

চিটাগাং ব্রাঞ্চের ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির ইস্তাহারটির থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইংরেজের প্রতি বিপ্লবী দলটি কি ধরনের মনোভাব পোষণ করতেন। এমন কি ইংরেজ পরিবারের মহিলা ও শিশুদের প্রতিও ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির কোন সমবেদনা ছিল না। তা না হলে বলা হয়েছিল কেন পুরুষ, মহিলা কিংবা শিশুদের জ্যান্ত অথবা মৃত অবস্থায় বিপ্লবী দলের প্রধান কার্যালয়ে এনে দিতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে? অর্থাৎ ইংরেজ পরিবারের কারো প্রতি দুর্বলতা ছিল না ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির। মাস্টারদা ছিলেন দৃঢ়চেতা মানুষ। অথচ তাঁর শারীরিক গঠনটি ছিল ছিপছিপে। মনে ছিল পরাধীনতার গ্লানি। পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে তিনি দল গড়ছিলেন বিপ্লবী মন্ত্রে। দলের প্রতিটি সভ্য দলের আদর্শ রক্ষা করতে জীবন দিতে রাজি ছিলেন। মাস্টারদা গড়ে তুলেছিলেন প্রত্যেকটি দলের সদস্যকে নিজের মত করে।

ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সব পরিকল্পনাই নেওয়া হত শ্রীসূর্য সেন ওরফে মাস্টার পরিচালনায়, প্রকৃতপক্ষে মাস্টারদার কথাই ছিল দলের শেষ কথা। দলের প্রতিটি সদস্য মাস্টারদার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। মাস্টারদার নির্দেশ মানতে গিয়ে দলের সদস্যদের কাছে কোন বিপদ এলে সেই বিপদকে তারা বিপদ বলে গণ্য করতেন না।

মাস্টারদার রোগা চেহারাটির মধ্যে যে এত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জমে ছিল তাঁর চেহারা দেখে বাইরের লোকের তা বোঝার সাধ্য ছিল না।

উপরোক্ত ইস্তাহারটি থেকে বোঝা যায় কী অপরিসীম ক্রোধ জন্মেছিল ভারতের ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সদস্যদের। মাতৃভূমিতে বিদেশি শাসককে কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না মাস্টারদা ও তাঁব অধীনস্থ সশস্ত্র বিপ্লবীরা। তাই বোধহয় মহান বিপ্লবী মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের মাটিতে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

১৯৩২ সাল। ১৩ জুন। ধলঘাটে হত্যা করা হল ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন ২৪ জুন পাহাড়তলিতে খুন করা হল মিসেস সুলিভ্যানকে। মিসেস সুলিভ্যান ছিলেন বছর যাটের একজন বয়স্কা মহিলা। পর পর এই দুটি হত্যাকাণ্ডেব ফলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ায় ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসন দারুণভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির বিপ্লবী সদস্যদের বিরুদ্ধে।

ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিস তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিল ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সদস্যদের এবং দলের নেতা মাস্টারদাকে গ্রেপ্তারের জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির নেতৃত্ব ও সদস্যরা ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিসের সক্রিয়তার কথা ভালভাবেই জানতেন। সেইজন্য প্রতি পদক্ষেপে ছিল তাদের সচেতনতা। দলের নেতা সূর্য সেন দলের সদস্যদের অ্যালার্ট করে দিয়েছিলেন। কোনভাবে দলের কোন সদস্য গ্রেপ্তার হলে দলের কাজকর্ম সম্বন্ধে কোন কিছু যেন প্রকাশ না পায় সেই ব্যাপারেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল দলের প্রতিটি সদস্যকে। প্রয়োজনে জীবন দিতে হবে কিন্তু বিপ্লবী দলের কোন পরিকল্পনা ফাঁস করা চলবে না।

সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদার নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান। দলের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যে কোন মূল্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন দলের প্রতিটি সদস্য। তাঁদের আবার ভয় কী। তাঁরা তো জীবনের বিনিময়ে মাতৃভূমির মুক্তিমন্ত্রে মাস্টারদার দলে যোগ দিয়েছিলেন। মাস্টারদার নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করতে হবে—সেই কথা জেনেই তাঁরা দলে নাম লিখিয়েছিলেন।

মাস্টারদা বুঝেছিলেন—তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে গেলে শুধুমাত্র যুবকদের দলে নিলেই চলবে না। যেই দৃঢ়চেতনাসম্পন্ন যে যুবতীরা দলের উদ্দেশ্য সফল করতে আগ্রহী তাদেরও দেখেশুনে দলে নিতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক ছিল চট্টগ্রাম জেলা সশস্ত্র বিপ্লবের পীঠস্থান। পাহাড় ঘেরা চট্টগ্রাম। পাশে সমুদ্র। সশস্ত্র বিপ্লবী দলটি সব পরিকল্পনাই নিত খুব গুপ্তভাবে।

ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন ও মিসেস সুলিভ্যানের হত্যাকাণ্ডের পর রাজদ্রোহী ও হত্যাকারী হিসেবে মাস্টারদা ও তাঁর দলের অন্যান্য বিপ্লবী সদস্যদের গ্রেপ্তার করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসন। ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের আমলারা বুঝতে পেরেছিলেন—ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সদস্যদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে না পারলে বহু ইংরেজের জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

গোয়েন্দা পুলিসের ঝানু অফিসার মহল সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখছিলেন বিপ্লবী দলের কাজকর্মের উপর। বিপ্লবী দলের সদস্যরাও জানতেন গোয়েন্দা বিভাগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা। মাস্টারদাও দলের প্রতিটি সদস্যকে পুলিসের দৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি এবং দলের নেতা সূর্য সেন সম্বন্ধে নানা ধরনের খোঁজখবর থাকলেও— দলের সাথে নারী বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ঘনিষ্ঠতার কথা জানা ছিল না ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিসের।

১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি গৈরালা থেকে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হলেন মহান বিপ্লবী সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদা। গ্রেপ্তার করার সময়

মাস্টারদার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল গুলিভর্তি একটি পিস্তল। এ ছাড়াও পাওয়া গিয়েছিল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। এই সব অতি প্রয়োজনীয় নথিপত্র থেকে জানা গিয়েছিল প্রীতিলতার কথা। ব্রিটিশ প্রশাসন জানতে পারল যুবতী প্রীতিলতা ছিলেন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির একনিষ্ঠ একজন সশস্ত্র বিপ্লবী। আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে তাঁর কোন অসুবিধা ছিল না। মাস্টারদার মত নেতার আদেশে প্রীতিলতা যে কোন কঠিন কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

প্রীতিলতা যখন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন সেই সময় তিনি ছিলেন মাত্র ১৯/২০ বছরের একটি যুবতী। এই বয়েস জেনেও দলের সর্বময় নেতা মাস্টারদা তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন চট্টগ্রামের রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আক্রমণের প্রধান সেনাপতি হিসেবে। মাস্টারদা বুঝেছিলেন এই যুবতীটির কোন গুরুতর দায়িত্বভার অর্পণ করলে সে পিছিয়ে আসার মেয়ে নয়। হাসিমুখে দায়িত্ব কার্যকর করতে প্রীতিলতা সচেষ্ট হবে। মাস্টারদা প্রীতিলতাকে বোনের মত দেখতেন। বড় ভালবাসতেন এই অসম সাহসী মেয়েটিকে। যদিও মহান বিপ্লবী মাস্টারদার কাছে দলের প্রতিটি সদস্যই আপন ছিলেন।

মাস্টারদার নির্দেশে বিশ বছর বয়সের যুবতী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির পক্ষে চট্টগ্রামের পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আক্রমণে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। রেলওযে ইনস্টিটিউট আক্রমণ করার আগে সৈনিকের বেশে নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন।

প্রীতিলতার নেতৃত্বে পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউটটি আক্রমণ করা হয়েছিল ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। এই আক্রমণের সময়ই মিসেস সুলিভ্যানের মৃত্যু ঘটল এবং অন্যান্য কিছু লোকজনও আহত হয়েছিল।

আজ ভাবতেও বেদনা লাগে—পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউট অপারশেনের পর অ্যাকশনের প্রধান সৈনিক প্রীতিলতার মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছিল পাহাড়তলি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সন্নিহিত অঞ্চলে। অপারেশন করতে গিয়ে বিপ্লবী সশস্ত্র নারী প্রীতিলতার মৃত্যুতে দলের

সদস্যরা দারণভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। ভাবা যায়নি এত অল্প বয়সে প্রীতিলতার জীবনের অবসান হবে। প্রীতিলতা হয়ত নিজেও জানতেন না—মৃত্যু তাঁকে হাতছানি দিয়েছে। এতবড় অপারেশনের পর প্রীতিলতার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না মাস্টারদা কিন্তু জানতেন।

অ্যাকশনের আগে প্রীতিলতা যখন সৈনিকের বেশে নিজেকে সজ্জিত করছিলেন তখনই মহান নে গা মাস্টারদা বুঝেছিলেন এই দৃঢ়চেতা মেয়েটি পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে নিজেই নিজের জীবন শেষ করে দেবে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করাতে যাওয়ার আগে প্রীতিলতা পকেটে পুরে নিয়ে গিয়েছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইডের পুরিয়া। প্রীতিলতার প্রতিজ্ঞা ছিল কোন মতেই তাঁকে যেন পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হতে না হয়। অপারেশনের পরে প্রীতিলতা যখন বুঝতে পেরেছিলেন পুলিসের হাত থেকে তাঁর নিস্তার নেই তখনই পকেট থেকে সায়ানাইডের পুরিয়া বার করে মুখে পুরে দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিস প্রীতিলতাকে জীবন্ত ধবতে না পেরে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। হয়ত একটি বিপ্লবী নারীর দেশের স্বাধীনতার জন্য এই নির্ভিকভাবে মৃত্যুকে তারা মনে মনে শ্রদ্ধাও পোষণ করে থাকতে পারে। তা না হলে তাদের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবীদের নিয়ে কম্পন শুরু হয়েছিল কেন?

প্রীতিলতার মৃতদেহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল শবব্যবচ্ছেদ করার জন্য মর্গে, শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল প্রীতিলতার মৃত্যু ঘটেছে পটাসিয়াম সায়ানাইডে। চট্টগ্রাম রিপাব্লিকান আর্মির সভ্যবৃন্দর বুঝতে অসুবিধা হয়নি বিপ্লবী নারীটি দলের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। ভয়ে পিছিয়ে আসেননি দলের নীতি অমান্য করে। বাহ্যিকভাবে না দেখাতে পারলেও সাধারণ ভারতবাসী প্রীতিলতার মৃত্যুতে শোকার্ত হয়েছিলেন। বিদেশি সরকারের ভয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রীতিলতার মৃত্যুতে শোক দেখানো সম্ভব ছিল না।

প্রীতিলতার মত ২০ বছরের দুরন্ত যুবতীটিকে কি ভুলে থাকা যায়?

পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে প্রীতিলতার লেখা একটি চিঠি মামলায় এগজিবিট করা হয়েছিল। সেই চিঠি থেকে জানা গিয়েছিল—প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মাস্টারদার কাছ থেকে ডাক পেয়েছিলেন পাহাড়তলি আক্রমণে যোগ দেওয়ার জন্য। মাস্টারদার মত বিরাট মাপের নেতা তাঁকে পাহাড়তলি অপারেশনে নেতৃত্ব দিতে বলায় একজন নারী হিসেবে প্রথম দিকে প্রীতিলতার মধ্যে খানিকটা দ্বিধা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দলের শ্রদ্ধেয় নেতা মাস্টারদার অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশে শেষ পর্যন্ত প্রীতিলতা অপারেশনের নেতৃত্ব নিতে সম্মত হয়েছিলেন। মাস্টারদার আদেশ তিনি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন সবরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করে। সশস্ত্র বিপ্লবের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে যখন মাস্টারদার নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মিতে যোগ দিয়েছেন—তখন মাস্টরদার নির্দেশ অমান্য করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অতবড় দায়িত্বভার কোন পুরুষ সদস্যকে না দিয়ে মাস্টারদার মত নেতা যখন একজন নারী সদস্যকে দিয়েছেন তখন বুঝেসুজেই সেই কাজের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

বিপ্লবীদের আবার ভয় কিসের! প্রতি পদেই তো মৃত্যু তাদের হাতছানি দিতে পারে। দেশের জন্য জীবন বলিদান—সেই তো বিপ্লবীদের অভিপ্রেত।

পাহাড়তলিতে অপারেশনের আগে সেনানায়িকা হিসেবে প্রীতিলতা নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল দলের কিছু সদস্য। সময়ের ঘণ্টা বাজলে শুরু হয়েছিল আক্রমণের পালা।

মাস্টারদার একটি চিঠি থেকেও প্রীতিলতার নেতৃত্বে পাহাড়তলির অপারেশনের বক্তব্য সমর্থিত হয়েছিল। মাস্টারদার সেই চিঠিটি পেশ করা হয়েছিল।

মাস্টারদা ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি প্রীতিলতাকে উদ্দেশ করে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :—

"To day I remember more that emblem shed. pure and beuatiufl whom I immursed fifteen days ago, putting weapon in her one hand and nector in the other. The remembrances of her is predominant even for a momemnt during these fifteen

days, whom I sent to the field of battle dressing her up with my own hands in battle attire whom I permitted to Jump into the sure jaws of death.

When I told her pitcnsely after I had dressed her for the last time and her Dada would never smiled a little."

চিঠিটি সম্ভবত ̐ বিজয়া দশমীর দিন লেখা হয়েছিল। কারণ চিঠিটির মাথায় লেখা ছিল "̐ বিজয়া"।

প্রীতিলতার মৃত্যুতে মহান বিপ্লবী সূর্য সেন ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলেন। মাস্টারদা নিজের হাতে প্রীতিলতাকে সৈনিকের বেশে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর একহাতে দিয়েছিলেন অস্ত্র, অন্য হাতে দিয়েছিলেন 'বিষ'। তাকে ১৫ দিন যাবৎ একবারের জন্য ভোলা সম্ভব হচ্ছিল না। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেই তাকে পাঠানো হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ ছিল প্রীতিলতার ওপর। মৃত্যু তাঁকে হাতছানি দিয়েছে বুঝতে পেরে মাস্টারদা হাসিমুখে প্রীতিলতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে পারেননি। তাই বোধহয় লিখেছিলেন—'Dada would never smiled a little.'

অপারেশনের পর প্রীতিলতা পুলিসের হাত থেকে গ্রেপ্তার এড়াতে মাস্টারদার দেওয়া পটাসিয়াম সায়ানাইড ব্যবহার করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

চিঠিটির বয়ান থেকে বোঝা যায়—মাস্টারদা প্রীতিলতাকে স্নেহের চোখে দেখতেন। প্রীতিলতার মত বিপ্লবী যুবতীটিকে তিনি দলের কাজে অনেক-খানি বিশ্বাস ও নির্ভর করতেন। মাস্টারদার বিচার-বিবেচনা ছিল নির্ভুল।

চিঠিতে ব্যবহৃত "নেকটার" কথাটির মানে ছিল 'বিষ' অর্থাৎ পটাসিয়াম সায়ানাইডের পুরিয়া তুলে দেওয়া হয়েছিল বিপ্লবী প্রীতিলতার হাতে। ব্যাটেল অ্যাটেয়ার কথাটি দিয়ে বোঝানো হয়েছিল যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকের পোশাক। সৈনিকের পোশাকেই প্রীতিলতার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল পাহাড়তলি আক্রমণের পর।

মাস্টারদার একটি চিঠি থেকে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল—দীর্ঘ দু-মাসের অশেষ প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামের ব্রিটিশের তৈরি অস্ত্রাগারে অপারেশন করা সম্ভব

হয়েছিল। মাস্টারদার নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির বিপ্লবীরা সদস্যরা এই অপারেশনের ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথম অবস্থায় ব্রিটিশ প্রশাসন পর্যন্ত হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন এই ধরনের অপারেশন দেখে।

ব্রিটিশ আর্মির সাথে ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সদস্যদের ১৯৩০ সালের ২২ এপ্রিল জালালাবাদ হিলসে প্রায় দুই/আড়াই ঘণ্টা লড়াই হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ আর্মি পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির ১২ জন বিপ্লবী সৈনিক প্রাণ হারিয়েছিলেন এই সংঘর্ষে। যখন প্রায় বিপ্লবীদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে এসেছিল তখন জালালাবাদ হিলস থেকে নানা কৌশলে ব্রিটিশ সৈনিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে নেমে এসেছিলেন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সৈনিকরা। এর পর তাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন।

মাস্টারদা একটি চিঠিতে নিজেই স্বীকার করেছিলেন পুজোর ছুটির পর তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে অস্ত্রাগার আক্রমণের ব্যবস্থাদি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে আশ্চর্যজনকভাবে রানীর কথা প্রায় সবাই ভুলে বসেছিলেন।

ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসন ক্যাপ্টেন ক্যামরুন হত্যা ও অন্যান্য কয়েকটি অভিযোগে একটি ফৌজদারী মামলা রুজু করেছিলেন। মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সর্বময় নেতা সূর্যকুমার সেন ওরফে মাস্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্ত।

কল্পনা দত্তও ছিলেন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির একজন বিশিষ্ট সদস্যা। কল্পনা দত্ত ছিলেন কলেজে পড়া মেয়ে। ১৯৩৩ সালের ১৯ মে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তকে।

মামলার তদন্তকালে জানা গিয়েছিল—মাস্টারদার হেফাজত থেকে যে রিভলভারটি পাওয়া গিয়েছিল, সেই রিভলভারটি ছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার থেকে লুণ্ঠিত রিভলভারের মধ্যে একটি। স্বভাবতই অনুমান করা যেতে পারে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার থেকে বিপ্লবীরা একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র লুণ্ঠন করেছিলেন।

আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে কি অস্বাভাবিক মানসিক দৃঢ়তা ছিল বিপ্লবী দলটির সদস্যদের।

মাস্টারদার নেতৃত্বে অস্ত্রাগার আক্রমণটি হয়েছিল অতি নিখুঁতভাবে। পরাধীন ভারতবাসীর কাছে এই ধরনের আক্রমণ ছিল অভিনব।

তদন্তাদেশে তদন্তকারী অফিসার মামলায় চার্জশিট দাখিল করেছিলেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১/ ১২১-এ/ ৩০২/ ১০৯ ধারায়। এ ছাড়াও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অস্ত্র আইনের ১৯-এফ ধারা ও বিস্ফোরক আইনের ৪-বি ধারায়।

ক্যাপ্টেন ক্যামারুন হত্যা মামলায় আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্তকে।

ভাবা যায়, বিংশ শতাব্দীর চতুর্দশ দশকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বা কল্পনা দত্তর মত মেয়েরা পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ সরকারকে হত্যা পর্যন্ত করতে পিছপা হননি।

প্রীতিলতা আত্মহত্যা করায় তাঁকে বিচারের প্রহসনেব সম্মুখীন হতে হয়নি। ইংরাজ সরকারের বিচারালয়ে বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে বিচার—সে তো বিচারের নামে প্রহসন। ফলাফল তো জানাই আছে।

অভিযুক্ত আসামীদের বিচার হয়েছিল বঙ্গীয় ফৌজদারী (সংশোধিত) আইনের বিধি ব্যবস্থা মোতাবেক নির্দিষ্ট কমিশনারদের আদালতে, বঙ্গীয় ফৌজদারী (সংশোধিত) আইনটি প্রকৃতপক্ষে তৈরি করা হয়েছিল ভারতের ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্য।

কমিশনার্স আদালতে সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগটিতে বলা হয়েছিল—অভিযুক্ত আসামী সূর্য সেন ইংরেজ শাষণের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কার্যে যুক্ত রয়েছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারায়।

অভিযুক্ত আসামী চার্জ শোনার পর বলেছিলেন তিনি নির্দোষ।

দ্বিতীয় অভিযোগটিতে বলা হয়েছিল তিনি ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মাস্টারদার বক্তব্য ছিল—তিনি এই অভিযোগেও নির্দোষ।

তৃতীয় অভিযোগে সূর্য সেনের বিরুদ্ধে বলা হয়েছিল—তিনি ধলঘাটে ক্যাপ্টেন ক্যামারুন হত্যার জন্য দায়ী। এই অভিযোগটিও মাস্টারদা অস্বীকার করেছিলেন।

তৃতীয় অভিযোগটি ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা। অর্থাৎ হত্যার অভিযোগ।

চতুর্থ অভিযোগটিতে বলা হয়েছিল—ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির নেতা হিসেবে সূর্য সেন মিসেস সুলিভ্যানকে হত্যার ব্যাপারে অন্যান্যদেরও প্ররোচিত করেছিলেন। এই জন্য চার্জ করা হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/ ১০৯ ধারায়।

অভিযুক্ত আসামী সূর্য সেন এই অভিযোগটিও অস্বীকার করেছিলেন।

সূর্য সেনের বিরুদ্ধে পঞ্চম অভিযোগটি ছিল অস্ত্র আইনের ১৯-এফ ধারায়।

মাস্টারদার একই বক্তব্য ছিল তিনি নির্দোষ।

এর পরেই আনা হয়েছিল কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদারের বিরুদ্ধে। তাদের দু-জনের বিরুদ্ধেই আনা হয়েছিল ক্যাপ্টেন ক্যামারুনকে খুন করার অভিযোগ। বলা হয়েছিল, একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে তাঁরা এই হত্যাকাণ্ডে শামিল হয়েছিলেন। আইনের ভাষায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অভিযোগ। কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদার বলেছিলেন মিথ্যে অভিযোগে তাঁদেব জড়ানো হয়েছে। নারী হলেও কল্পনা দত্তের মধ্যে কোন ভয়-ভীতি লক্ষ্য করা যায়নি। মাস্টারদা বোধহয় প্রীতিলতা এবং কল্পনাকে একই ভাবে তৈরি করেছিলেন। যুবতী হলেও প্রীতিলতা বা কল্পনা যুবকদের থেকে কোন অংশে পিছিয়ে ছিলেন না—মাস্টারদা বোধহয় ইংরেজ প্রশাসনকে তা প্রমাণ করে দিতে পেরেছিলেন।

প্রীতিলতা অপারেশন শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন ব্যাটেল ফিল্ডে আর কল্পনাকে বন্দি অবস্থায় দাঁড়াতে হয়েছিল হত্যার অভিযোগে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়। প্রীতিলতা বা কল্পনার কাছে মৃত্যু কখনই ত্রাস ছিল না। এই দুটি মেয়েই জানতেন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার কায়দা-কানুন। মাস্টারদার নেতৃত্বেই তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র চালানো শিখেছিলেন। দলের প্রতিটি সদস্য প্রীতিলতা ও কল্পনাকে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতেন।

তারকেশ্বর দস্তিদারের বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক অভিযোগ ছিল—তিনি ১৯৩১ সালের ৬ মার্চ খুন করেছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্‌পেক্টার শ্রীশশাঙ্ক ভট্টাচার্যকে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তারকেশ্বর দস্তিদারের বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগ আনা হয়েছিল। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায়। স্পেশাল ট্রাইবুনালেই তারও বিচার হয়েছিল।

স্পেশাল ট্রাইবুনালে অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রমাণ করার জন্য সরকারপক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ শুরু হয়েছিল ১৯৩৩ সালের ১৫ জুন থেকে। ১৭০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল সরকার পক্ষ থেকে। ৩৪৬টি নথিপত্র অভিযোগ প্রমাণের জন্য দাখিল করা হয়েছিল স্পেশাল ট্রাইবুনালে। নথিপত্রগুলির উপর এগজিবিট নম্বর দেওয়া হয়েছিল।

১৯৩৩ সালের ১৪ আগস্ট বিচার সমাপ্ত হওয়ার পর স্পেশাল ট্রাইবুনাল মামলার রায়দান করেছিলেন। রায়ে যে ধরনের আদেশ আশা করা গিয়েছিল সেই ধরনের আদেশই হল। সব চার্জ প্রমাণ হওয়ায় মহান বিপ্লবী সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদাকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। অন্যদিকে হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কল্পনা দত্ত এবং তারকেশ্বর দস্তিদারকে হত্যাপরাধে দোষী বলে ঘোষণা করেছিলেন স্পেশাল ট্রাইবুনাল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারকে। কল্পনা দত্ত একজন মহিলা হওয়ায় তাঁকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।

বাঙালি নারী সমাজের গর্ব প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কল্পনা দত্ত। এই দুই অসম সাহসী নারী নিজেদের বাড়ি ঘর সংসার পরিত্যাগ করেছিলেন বিদেশি শাসনের নাগপাশ থেকে দেশকে স্বাধীন করতে। আজ থেকে এত বছর আগে যখন সমাজ এত এগিয়ে আসেনি, সভ্যতা এত উন্নত হয়নি, সে-সময়ে প্রীতিলতা বা কল্পনার মত নারীর অবদানের কথা ভোলা যায়, না ভোলা উচিত?

প্রীতিলতা ও কল্পনা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন পুরুষের মতই নারীরাও পারে দুঃসাহসী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে। অবশ্যই মনের জোর থাকা চাই। পারুল মুখার্জি, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত এবং উজ্জ্বলা মজুমদারের মত নারীরা ব্যক্তিগত জীবনে নিজেদের জন্য কিছুই পেতে চাননি। ওরা শুধু

দিয়েই গেলেন, পেলেন না কিছুই। স্বাধীন ভারতে ওদেরও আমরা দেওয়ালে ছবি করেও রাখতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেছি এইসব বীরাঙ্গনাদের ছবি সংগ্রহ করতে কিন্তু সাধ্যে কুলায়নি।

পুরাণে নারীদের অবশ্য বলা হয়েছে আদ্যাশক্তি। কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়। নারীশক্তিকে যথাচিত মর্যাদার সাথে প্রয়োগ করতে না পারায় নারীশক্তির প্রকৃত মূল্যায়ন বোধ হয় আজও হয়নি।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী দল এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদের নিয়ে প্রকৃত ইতিহাস লিখতে গেলে পারুল মুখার্জি, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত বা উজ্জ্বলা মজুমদারকে বাদ দিয়ে কখনই সেই ইতিহাস লেখা যাবে না।

কমিশনার্স আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডিত আসামী সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্ত আপিল দায়ের করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। আপিলকারী দণ্ডিত আসামীদের পক্ষে হাইকোর্টে তদানীন্তন-কালের প্রখ্যাত আইনজীবীরা দাড়িয়ে ছিলেন। এই সব আইনজীবীদের মধ্যে ছিলেন শ্রী বি সি চ্যাটার্জি, শ্রীরাধিকারঞ্জন গুহ, শ্রীসন্তোষকুমার বসু, শ্রীপরিমল মুখার্জি, শ্রী জে সি গুপ্ত এবং শ্রী এ কে দাস। ভারতের ইংরেজ সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্যার এন এন সরকার।

ব্রিটিশ আমলে। এই ধরনের আপিলের ফলাফল কী হতে পারে বিপ্লবী সূর্য সেনের পক্ষে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তাই আইনের লড়াই করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না দণ্ডিত আসামীদের।

কলকাতা হাইকোর্টে আপিলের শুনানি হয়েছিল একটি স্পেশাল বেঞ্চে। তিনজন মাননীয় বিচারপতিকে নিয়ে স্পেশাল বেঞ্চটি গঠিত হয়েছিল। তিনজন বিচারপতির মধ্যে ছিলেন প্যাংরিজ সাহেব, আমীর আলী এবং এস সি ঘোষ।

কমিশনার্স আদালতের দীর্ঘ রায়টি থেকে পাওয়া গিয়েছিল চট্টগ্রামের ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সদস্যদের কার্যকলাপের এক দীর্ঘ ইতিহাস। আপিলের পেপার বুকে ছাপা হয়েছিল সাক্ষীদের সাক্ষ্য, নিম্ন আদালতের রায় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ।

পেপারবুককে কেন্দ্র করে হাইকোর্টে আপিলের শুনানি হতো। মাননীয় বিচারপতি এবং উভয় পক্ষের কাছেই পেপার বুক থাকত। হাইকোর্টের মাধ্যমেই পেপার বুক তৈরি হত। তাছাড়া ফাঁসির আদেশ দিলে হাইকোর্টে ডেথ্ রেফারেন্স করতে হত। সুতরাং কমিশনার্স কোর্ট ডেথ রেফারেন্স করেছিলেন হাইকোর্টে আইনমাফিক।

কমিশনার্স কোর্টের রায় থেকে জানা গিয়েছিল, ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে ১৯৩৩ সালের ১৯ মে পর্যন্ত চট্টগ্রামের প্রায় সমগ্র বিপ্লবী কাজকর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস। সেই ইতিহাসে সন্নিবেশিত ছিল একাধিক চমকপ্রদ ঘটনার কথা।

সরকারপক্ষর মুখ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল বিপ্লবী দলের নানা ঘটনার কথা। ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির নেতা মাস্টারদাকে অনেকেই ভালভাবে জানতেন। তাই পুলিসের পক্ষে বিপ্লবী দলটি সম্বন্ধে কিছুই অজানা ছিল না। তদন্তে সবই জনাতে পেরেছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিস।

মামলাটিতে সরকারপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল—সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদা ছিলেন চট্টগ্রাম রিপাব্লিকান আর্মির প্রধান নেতা। তাঁর নির্দেশে দলটি পরিচালিত হত। সূর্য সেন ছিলেন অস্ত্রাগার অপারেশনের মূল নৃপতি। মাস্টারদার পরিকল্পনামাফিক অস্ত্রাগার অপারেশনের কাজটি হয়েছিল অতি নিপুণতার সাথে। ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির বিপ্লবী সৈনিকরা শামিল ছিলেন অস্ত্রাগার আক্রমণে।

মাস্টারদার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল ১৮ এপ্রিল তিনি মোটে চট্টগ্রামেই ছিলেন না। পুলিস অফিসার রমণীমোহন মজুমদারের ব্যক্তিগত ডায়েরিটি ছাড়া সরকার পক্ষের কাছে এই ব্যাপারে আর কোন প্রমাণপত্র ছিল না। গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য-সাবুদ দিয়েও সরকার পক্ষ থেকে মাস্টারদার উপস্থিতি প্রমাণ করা যায়নি। উপযুক্ত সাক্ষ্য-সাবুদ না থাকায় আসামী পক্ষের বক্তব্য ছিল—১৮ এপ্রিল সূর্য সেন যে চট্টগ্রামে থেকে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলন এমন কোন গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য সরকারপক্ষ থেকে না আসায় কখনই সরকারপক্ষ বলতে পারে না—মাস্টারদা ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম থেকে অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

কমিশনার্স আদালত আসামী পক্ষের এই ধরনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। সরকারের বক্তব্য বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যসাবুদ থেকে বোঝা গিয়েছিল মাস্টারদার নেতৃত্বে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযান হয়েছিল ১৮ এপ্রিল, ১৯৩৩।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে যে সব বিপ্লবী যোগ দিয়েছিলেন তার একটি তালিকা পেশ করা হয়েছিল আদালতে। তালিকাটি অপারেশনের ঠিক পরের দিনই পাওয়া গিয়েছিল গণেশ দাসের বাড়ি তল্লাশি করে। এই তালিকাটিতে মাস্টারদার নাম ছিল অপারেশনের নেতা হিসেবে।

সরকারপক্ষ থেকে তালিকাটিকে আদালতে এগজিবিট করা হয়েছিল প্রমাণপত্র হিসেবে। মাস্টারদার লেখা একটি চিঠিও দাখিল করা হয়েছিল আদালতে। মাস্টারদা আদালতে নিজেই স্বীকার করেছিলেন চিঠিটা তাঁর নিজের হাতে লেখা। সেই চিঠিটিতেও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানের উল্লেখ ছিল। এ ছাড়া একাধিক পরিকল্পনার কথা লেখা ছিল সেই চিঠিতে। এই চিঠিটি পাওয়ায় সরকারপক্ষের কাছে অভিযোগ প্রমাণ করতে অনেক সুবিধা হয়েছিল।

অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষ থেকে কমিশনার্স আদালতের কাছে বক্তব্য রাখা হয়েছিল—পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আক্রমণকে কোনভাবেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে ধরে নেওয়া যায় না। আদালত অবশ্য এই যুক্তি মেনে নেননি।

পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউটটি ব্যবহার করতেন ইউরোপিয়ান এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা। বিপ্লবী দলটির বদ্ধমূল ধারণা ছিল—রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সদস্যরা ছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক। এই সব ইউরোপিয়ান অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের দেশের শত্রু হিসেবে দেখতেন বিপ্লবী দলটি। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির নেতৃত্ব সেনানায়িকা হিসেবে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আক্রমণ করতে পাঠিয়েছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আক্রমণ করার আগে একটি চিঠিতে লিখে গিয়েছিলেন—ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান

আর্মির বীর সৈনিকরা হাতে মারণাস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইংরেজদের প্রাণে শেষ করে ফেলার উদ্দেশ্য। ইংরেজদের উপর সশস্ত্র আঘাত হানতে হবে এই ছিল বিপ্লবী দলটির মূল নীতি। সশস্ত্র আঘাত হানতে না পারলে ভারতবর্ষের মাটি থেকে ইংরেজ প্রশাসন কখনই পাততাড়ি গুটবে না তা বেশ ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বিপ্লবী দলটি।

বিপ্লবী সদস্যদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল আঘাতে আঘাতে ইংরেজদের জোরবার করতে হবে। Blood calls blood. রক্তের বিনিময়ে রক্ত চাই। রক্ত না ঝরিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে না।

অবশ্য যারা অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী তারা কখনই বলেননি Blood calls blood. অহিংস বিপ্লবীরা মনে করতেন রক্ত না দিয়েও দেশকে স্বাধীন করা যায়। অহিংস আন্দোলনের বিপ্লবী নারী আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় বলে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা না করাই ভাল।

প্রসঙ্গক্রমে বলতেই হয়—সুভাষচন্দ্র বোস তিরিশের দশকে ছিলেন কংগ্রেসের সদস্য। দলগতভাবে তিনি ছিলেন সেইসময় অহিংস আন্দোলনের পূজারী। তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র একসময় দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন—তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। পুলিসের কাছে খবর ছিল তদানীন্তন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সুভাষ বোস মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে ১৯৩১ সালের ২৬ জানুয়ারিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করবেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করায় সেই ঘোষণা করা যায়নি।

আবার ফিরে আসা যাক সশস্ত্র নারী বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের কথায়।

১৯৩০ সালে বোমা বিস্ফোরণে সশস্ত্র বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। পুলিস ইনস্পেক্টর তারিণীচরণ মুখার্জিকে হত্যা করার অপরাধে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার আগে তাঁকে রাখা হয়েছিল আলিপুর জেলে। এই সময় প্রীতিলতা নানী কায়দায় আলিপুর জেলে ঢুকে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের

সাথে দেখা করেছিলেন। অসম সাহস না থাকলে একটি সশস্ত্র বিপ্লবী দলের নারীর পক্ষে জেলে ঢুকে একজন ফাঁসির আসামীর সাথে দেখা করা কখনই সম্ভব হত না। জেল রেজিস্টার থেকে দেখা গিয়েছিল—প্রীতিলতা অন্তত বার চল্লিশ আলিপুর জেলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রীতিলতাকে খুব স্নেহ করতেন।

ধলঘাট থেকে প্রীতিলতার একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। চিঠিটি থেকে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে প্রীতিলতার যোগাযোগের ব্যাপারটি জানা গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন প্রীতিলতার কাছে 'ফুট্যদা'। এই 'ফুট্যদা'কে প্রীতিলতা গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। প্রীতিলতা নিজেই স্বীকার করেছিলেন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস অর্থাৎ তাঁর 'ফুট্যদা' তাঁকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এনেছিলেন। অনেকের ধারণা প্রীতিলতা তারকেশ্বর দস্তিদারকে 'ফুট্যদা' বলে ডাকতেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস কখনই প্রীতিলতার 'ফুট্যদা' ছিলেন না।

প্রকৃতপক্ষে তারকেশ্বর দস্তিদার ধলঘাট ষড়যন্ত্রে বা পাহাড়তলি অভিযানে প্রীতিলতার সাথে যুক্ত ছিলেন। পাহাড়তলি অপারেশনের পর প্রীতিলতা পুলিসের কাছ থেকে গ্রেপ্তার এড়াতে নিজের কাছে থাকা পটাসিয়াম সায়নাইডের পুরিয়া মুখে পুরে দিয়ে আত্মহত্যা করলেও তারকেশ্বর দস্তিদারকে গ্রেপ্তার বরণ করে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। বিচারে তারকেশ্বর দস্তিদারকে দোষী সাব্যস্ত হতে হয়েছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবী নারী কল্পনা দত্ত ১৯৩২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পাহাড়তলি থেকে পুরুষের বেশে গ্রেপ্তার হওয়ার পর ২৩ নভেম্বর জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন। জামিনে ছাড়া পেয়েই কল্পনা দত্ত আত্মগোপন করেছিলেন। এই সময় অপর একটি ফৌজদারি মামলাও আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ঝুলছিল। অর্থাৎ সেই মামলাটিতেও কল্পনা দত্ত ছিলেন বিচারাধীন আসামী। কল্পনা দত্তকে পুলিস খুঁজে পাচ্ছিল না। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিস উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সরকারপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল—দলের নেতা সূর্য সেনকে গ্রেপ্তারের সময় কল্পনা দত্তকে একই জায়গায় দেখা গিয়েছিল। তাই তাঁকে সেই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

পরে কল্পনা দত্তকে গ্রেপ্তারের পরে গহিরা থেকে একটি বিশেষ ধরনের লিখিত প্রমাণপত্র পাওয়া গিয়েছিল। প্রমাণপত্রটি ছিল কল্পনা দত্তের নিজের হাতে লেখা। কিন্তু ভাগ্যক্রমে প্রমাণপত্রটির নানা অংশের লেখা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পুলিসের পক্ষে সম্ভব হয়নি নষ্ট হয়ে যাওয়া অংশে কী লেখা ছিল তা উদ্ধার করা। পত্রটির যে অংশ বোঝা গিয়েছিল—তার থেকে জানা গিয়েছিল—কল্পনা দত্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার আগে ছিলেন কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী। ছাত্রী থাকাকালীন সময়ে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের কাজকর্ম কল্পনাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল। দেশের পরাধীনতা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। দেশ তাঁকে ডাক দিয়েছিল। সেই ডাকে কলেজ ছেড়ে দিয়ে কল্পনা দত্ত যোগ দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মিতে সূর্য সেনের নেতৃত্বে।

কল্পনা দত্ত অবশ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাননি। সম্ভবত তখনও তিনি দলের সদস্য হননি।

কল্পনা দত্তের উপর দলের নির্দেশ ছিল—বিচারাধীন দলের সদস্যদের যে ভাবেই হোক জেল থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসতে হবে। তার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা তাঁকেই নিতে হবে। এ ছাড়াও কল্পনাকে আর একটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দায়িত্বটি ছিল অতি কঠিন। তাঁর উপর নির্দেশ ছিল জেলবন্দী বিচারাধীন দলের সদস্যদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছে দেওয়া। এই ধরনের কাজে ব্রতী হলে প্রতি পদক্ষেপে বিপদ।

কল্পনা দত্ত জানতেন এই নির্দেশ পালন করতে গেলে কী ফলাফল হতে পারে। কিন্তু তিনি সব জেনেও দলের নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। বিপ্লবীদের আবার জীবনের জন্য ভয় কী! জীবনপণ করেই তো বিপ্লবী দলে এসেছিলেন। দেশের মুক্তির জন্য যে কোন ঝুঁকি তাঁকে তো নিতেই হবে। কল্পনা দত্তকে গ্রেপ্তার করে যখন বিচারপর্ব শেষ হয়েছিল তখন তাঁর বিরুদ্ধে মামলার সাক্ষ্য-সাবুদ বিচার-বিবেচনা করে আদালত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন —কল্পনা দত্ত ছিলেন ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন।

আসামী মহিলা হওয়ায় তাঁকে ফাঁসি না দিয়ে দেওয়া হল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।

প্রীতিলতার ওয়াদ্দেদারের কথা হয়ত কিছু কিছু বয়স্কলোক খানিকটা জানেন কিন্তু বেথুন কলেজের ছাত্রীটির কথা আজ অনেকেই জানেন না।

মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ বহাল রাখলেও রায়ের উপসংহারে মন্তব্য করেছিলেন—সশস্ত্র বিপ্লবী দলের নারী সদস্যাদের প্রতিও কোন অনুকম্পা দেখানোর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এই সশস্ত্র বিপ্লবীরাও প্রয়োজনে বিদেশিদের হত্যা করতে কম্পিত হত না। বহু মহিলা ও শিশুকে এই নারী বিপ্লবীরা হত্যা করেছে।

সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির আদেশ ও কল্পনা দত্তর বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ বহাল রেখে কলকাতা হাইকোর্ট আপিলের পরিসমাপ্তি টেনেছিলেন।

কবি সুকান্তের ভাষায়—এই সব বিপ্লবীদের আদর্শকে উপলক্ষ করে কি বলা যায় না—

"রক্তে আন লাল
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে
ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।"

স্মৃতিপট থেকে এই সব বিপ্লবীদের কথা মিলিয়ে গেলেও ওঁদের কিছু যায় আসে না। বিপ্লবী যুবকদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু যে সব নারী ব্যক্তিগত জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে কী একটি পূর্ণ ইতিহাস তৈরি করা যেত না?

দেশ অর্ধশতাব্দিকাল স্বাধীন হয়েছে। আমরা বর্তমানে স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমাদের কি ওঁদের জীবনের মূল্যায়ন করার কোন প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত ছিল না?

বিশেষত সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের কথা লিখতে বসে কেবলই বলতে ইচ্ছে করছে—

"পৃথিবী ও ইতিহাস কাঁপে
আজ অসহ্য আবেগে
ওদের পায়ের স্পর্শে মাটিতে সোনার ধান

রঙ লাগে মেঘে।
এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ
ওদের পতাকা।
মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী
আজ ঢাকা।”

“আদালতের আঙিনায়” বইটি লিখতে বসেও বিপ্লবীদের কথা বলতে গিয়ে কবিতাটির লাইনকটি উল্লেখ করেছিলাম।

বিদেশি শাসনের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য—হে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে যে ভাবে তোমরা আত্মবলিদান করেছ—তার জন্য তোমাদের জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

হে বিপ্লবী নারী—জানি না যে ধরনের স্বাধীনতা তোমাদের কাম্য ছিল—সেই স্বাধীনতা আমরা সত্যি পেয়েছি কি না!

দৃঢ় বিশ্বাস রেখে বলা যেতে পারে—তোমাদের কাজের মূল্যায়ন একদিন হবেই। কিছুই যাবে না ফেলা।

।। ছয় ।।

এবার ফিরে যাওয়া যাক বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। অনেকেই জানেন সরলা দেবী চৌধুরাণীর কথা। অহিংস আন্দোলনের প্রেরণাদাত্রী হলেও সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাথে সরলা দেবী চৌধুরাণীর একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

সরলা দেবী চৌধুরাণী ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে। ১৮৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সরলাদেবীর জন্ম হয়েছিল। সরলাদেবীর পিতৃদেব ছিলেন কৃষ্ণনগর জমিদার বংশের সন্তান জানকিনাথ ঘোষাল। জানকিনাথ ঘোষাল ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তখন পর্যন্ত পরাধীন ভারতবর্ষে কোন সশস্ত্র বিপ্লবী দল তৈরি হয়নি।

সরলা দেবীর থেকে মাতুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বয়সে বছর এগারোর বড়। সরলা দেবী ছিলেন শিক্ষিতা মহিলা, সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। বাংলা ১৩০৬ থেকে ১৩১৪ সন পর্যন্ত তিনি 'ভারতী' সম্পাদনা করেছেন। ভারতীর সম্পাদিকা থাকাকালীন অবস্থায় সরলা দেবীর লক্ষ্য ছিল জাতির মধ্যে আত্মসচেতনতা সঞ্চার এবং স্বাবলম্বী হওয়ার মনোভাব জাগ্রত করার। দৈহিক ও মানসিক উন্নতিকল্পে তিনি কুস্তিগীর নিযুক্ত করেছিলেন যুবকদের শরীরচর্চার জন্য। এই জন্য বেশ কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল।

১৯০৪ সালে সরলা দেবী বাংলার নানাস্থানে 'বারস্বামী' ব্রত প্রবর্তন করেছিলেন। যুবকগণ এই দিনটিতে পত্রপুষ্পশোভিত তরবারি প্রদক্ষিশ করে দুষ্ট দমনের সংকল্প গ্রহণ করতেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কিন্তু এই অহিংস আন্দোলনের পূজারী সরলাদেবী অপ্রকাশ্যে বাংলার বহু সশস্ত্র বিপ্লবীকে নানাভাবে প্রেরণা দিয়েছিলেন ও সাহায্য করেছিলেন। একাধিক বিপ্লবী যুবক সরলাদেবীর সাথে যোগাযোগ রাখতেন। বিপ্লবী বারীন ঘোষ বহুবার সরলাদেবীর কাছে এসেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে চিঠি লিখতেন সরলাদেবীকে। শ্রীঅরবিন্দর দাদা ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ছিলেন সরলা দেবীর একজন

ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিপ্লবী যতীন ব্যানার্জির সাথেও যোগাযোগ ছিল তাঁর। যতীন ব্যানার্জির মাধ্যমে বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল হতেন, যতীন ব্যানার্জিকে নানাভাবে সাহায্য করতেন সরলা দেবী।

বিপ্লবী বারীন ঘোষের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম একটি সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছিল কলকাতাব একটি পাড়ায়। সাইনবোর্ডটিতে লেখা ছিল—'ভারত উদ্ধার দল'। এই ভারত উদ্ধার দল বারীন ঘোষ তৈরি করেছিলেন সম্ভবত ১৯০৩ সালে। যতীন ব্যানার্জি ছিলেন এই ভারত উদ্ধার দলের একজন কর্মকর্তা।

ভারত উদ্ধার দলের ডেরায় যতীন ব্যানার্জি থাকতেন। তিনি শিক্ষক হিসেবে যুবকদের নানা দৈহিক কসরত, ড্রিল এবং ঘোড়ায় চড়া শেখাতেন।

সরলা দেবী নিজেই স্বীকার করেছিলেন—ভারত উদ্ধার দলের এই সব কাজকর্ম তিনি সমর্থন করতেন। যদিও ভারত উদ্ধার দলের কোন কোন কর্মসূচি তিনি মেনে নিতে পারেননি। ভারত উদ্ধার দল কর্মসূচি নিয়েছিলেন স্বদেশি ডাকাতি করে দলের জন্য দল টাকা-পয়সা সংগ্রহ করবে দলের স্বার্থে। সরলাদেবী এই কর্মসূচি মেনে নিতে পারেননি। যতীন ব্যানার্জির মাধ্যমে ভারত উদ্ধার দলের এই ডাকাতির কর্মসূচি তুলে নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সরলাদেবীর সঙ্গে যেমন সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাথে যতীন ব্যানার্জির মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। যদিও সরলা দেবী নিজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন অহিংস আন্দোলনের সাথে। তা সত্ত্বেও তিনি সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ছিলেন না।

সরলাদেবীর সাথে বিয়ে হয়েছিল ব্যবহারজীবী পণ্ডিত রামভুজ দত্তচৌধুরীর। পণ্ডিত রামভুজ ছিলেন উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী। তিনি তদানীন্তন 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় উগ্র মতামত প্রকাশ করায় ব্রিটিশ প্রশাসন তাঁর উপর ভীষণভাবে চটে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন 'হিন্দুস্থান' (লাহোর) পত্রিকার সম্পাদক। এমন কী লাহোরের চিফ কেটি আদেশ দিয়েছিলেন—পত্রিকার সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী হিসেবে পণ্ডিত রামভুজের নাম প্রকাশিত হলে

তাঁর ব্যবহারজীবীর লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। বিয়ের প্রথমদিকে সরলাদেবী নিজেও স্বামীর রাজনৈতিক আদর্শের সাথে সহমত পোষণ করতেন এবং স্বামী রামভুজকে রাজনৈতিক ব্যাপারে সাহায্য করতেন। পণ্ডিত রামভুজ দত্তচৌধুরী কোনদিনই গতানুগতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না।

ব্রিটিশ প্রশাসনের কোপদৃষ্টি থেকে স্বামী রামভুজকে বাঁচাতে সরলাদেবী স্বামীর কাজ নিজের স্কন্ধে ধারণ করে "হিন্দুস্থান" পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হিসেবে নিজের নাম ব্যবহার করেছিলেন। তিনি একটি ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশ করেন। এই ধরনের কৌশল নেওয়ায় সরকারি অপচেষ্টা ব্যাহত হয়েছিল। পণ্ডিত রামভুজ চৌধুরী ইংরেজ সরকারের কোপ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন অন্তত তখনকার মত।

সহিংস আন্দোলনের প্রতিও যে সরলা দেবী চৌধুরাণীর একটা সুপ্ত সমর্থন ছিল তা বোঝা গিয়েছিল তাঁর নানা কাজের প্রতি উদ্যোগ দেখে।

সরলা দেবী বাঙালি যুবকদের সৈন্যদলে ভর্তি করাতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন যদিও এই ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে রাওলাট আইন প্রবর্তন করলেন। এই নতুন আইনটি দমনমূলক হওয়ায় দেশময় এই রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল। পাঞ্জাবে এই আন্দোলন চরম রূপ নিয়েছিল। এর পরিণতিতে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।

রামভুজ দত্তচৌধুরীদের পরিবারের উপর সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ায় 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার উর্দু ও ইংরেজি সংস্করণ বন্ধ করে দেওয়া হল। পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দের সাথে পণ্ডিত রামভুজও অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাসিত হলেন। এই সময় ইংরেজ সরকার মনস্থ করেছিল—সরলাদেবী চৌধুরাণীকেও গ্রেপ্তার করা হবে। নানাদিক বিচার বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার সরলা দেবীকে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত হয়েছিল।

পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে বিমর্ষ হয়ে রবীন্দ্রনাথ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেছিলেন। ১৯১৯ সালে অমৃতসরে কংগ্রেস অধিবেশন। এর কিছুদিন আগে পাঞ্জাবের নির্বাসিত নেতাদের মুক্তি

দেওয়া হয়েছিল। সেইসঙ্গে মুক্তি পেয়েছিলেন সরলা দেবীর স্বামী রামভুজ দত্তচৌধুরী।

রামভুজ দত্তচৌধুরী সশস্ত্র বিপ্লব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরবর্তীকালে খানিকটা মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। নানা ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ দেখা দেওয়ায় সরলা দেবী স্ব-ইচ্ছায় হৃষিকেশে গিয়ে বসবাস করছিলেন। কিন্তু স্বামী রামভুজ ভীষণভাবে অসুস্থ হওয়ায় সরলাদেবী স্বামীর কাছে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু অনেক সেবাযত্ন করেও রামভুজকে বাঁচানো গেল না। ১৯২৩ সালের ৬ই আগস্ট রামভুজ দত্তচৌধুরী মারা গেলেন মুসৌরিতে।

রামভুজের মৃত্যুর পরে অবশ্য পাকাপাকিভাবে সরলাদেবী অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

সরলাদেবীর সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবীদলের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও বহু সশস্ত্র বিপ্লবীর সাথে তাঁর যোগাযোগ থাকায় নানাভাবে তিনি সাহায্য করেছিলেন তাদের। অবশ্য সবকিছুই ছিল খুব গুপ্তভাবে। অহিংস আন্দোলনের সেবিকা হওয়া সত্ত্বেও সশস্ত্র আন্দোলনে পরোক্ষভাবে সরলা দেবীর ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না।

সরলাদেবীর মত ভগিনী নিবেদিতার সাথেও সশস্ত্র বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী হয়েও ভারতবর্ষের পরাধীনতাকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি স্বাধীন ভারত দেখতে চেয়েছিলেন। আন্তরিক ভাবে ভগিনী নিবেদিতা সমর্থন করতেন বিপ্লবীদের কার্যকলাপ। তিনিও প্রয়োজনে পরামর্শ দিতেন বিপ্লবীদের। বারীন ঘোষ, যতীন ব্যানার্জি প্রভৃতি বিপ্লবীরা ভগিনী নিবেদিতার সাথে যোগাযোগ রাখতেন।

ভগিনী নিবেদিতার দৃঢ় ধারণা ছিল—কিছুটা অশান্তি না থাকলে পুরুষের পৌরুষ জাগ্রত হয় না। সরলাদেবী বিপ্লবীদের স্বদেশি ডাকাতি মেনে নিতে না পারলেও ভগিনী নিবেদিতা সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্বদেশি ডাকাতির পরিকল্পনা জেনেশুনে মেনে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে সরলা দেবী কিন্তু মনে করতেন রক্তে কলুষিত ধন নিয়ে বিপ্লব হয় না। দল

চালাতে আর্থিক প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে সশস্ত্র বিপ্লবীরা কিন্তু একাধিক ডাকাতি করেছিলেন। এই সব ডাকাতিগুলি স্বদেশি ডাকাতি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিল স্বদেশবাসীর কাছে।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ছিলেন সরলাদেবী চৌধুরাণীর খুব কাছের লোক। তিনি একসময় ছদ্মনামে বরোদায় সৈন্যবিভাগে ঢুকেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় থাকার সূত্রে যতীন ব্যানার্জির সাথে তাঁর খুব আলাপ-পরিচয় ছিল। বরোদায় অবস্থানকালে যতীন ব্যানার্জির সাথে শ্রীঅরবিন্দর বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হত। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পরাধীন ভারতবর্ষকে কীভাবে স্বাধীন করা যায় সেই বিষয়ে দুজনের মধ্যে নানা পরামর্শ চলত।

শোনা যায় শ্রীযতীন ব্যানার্জির কাছ থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ দেশকে স্বাধীন করার দীক্ষা নিয়েছিলেন। ডঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই কাহিনীটি পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন।

বাঙালি হওয়ায় সৈন্য বিভাগে যতীন্দ্রনাথের বেশিদিন কাজ করা সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে তিনি সৈন্যবিভাগ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং তিনি সৈন্যবিভাগে থাকা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেননি।

১৯০২ সালের কোন একসময় শ্রীঅরবিন্দর একখানি চিঠি নিয়ে বরোদা থেকে এসে কলকাতায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, শ্রীমতী সরলা দেবীর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সরলা দেবীর কাছের লোক হয়ে গিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী যতীন্দ্রনাথকে সশস্ত্র বিপ্লবী জেনেও তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে বিংশ শতকের একদম প্রথম দিকে অহিংস আন্দোলনের সাথে যুক্ত সরলাদেবীর মত একজন নারী সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন নানাভাবে।

একসময় কোনভাবে সরলা দেবীর হাতে রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের লেখা

একখানি বই এসে গিয়েছিল। বইটি পড়ে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। বইটির কোন অংশে বাঙালিদের উদ্দেশ করে লেখা হয়েছিল—'বাঙালি গিদ্ধর' বাঙালিকে 'গিদ্ধর' বলায় সরলা দেবী অপমানে উত্তেজিত হয়ে কিপলিংয়ের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখেছিলেন অতি কঠোর ভাষায়। তিনি কিপলিংয়ের উদ্দেশে লিখেছিলেন—তুমি বাঙালিকে 'গিদ্ধর' বলে সমগ্র বাঙালি জাতিকে অপমানিত করেছ। এই অপমান মোচনের জন্য আমার ভাইদের যে কোন একজনের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করছি। তৈরি হওয়ার জন্য তোমাকে পাঁচ বছর সময় দিচ্ছি। বন্দুক হোক, তলোয়ার হোক যে কোন অস্ত্রে তুমি নিজেকে উপযুক্তভাবে তৈরি করে নিতে পার—আমার ভাইরা তার জন্য তোমার সাথে লড়াই করতে তৈরি থাকবে। তখনই তুমি বুঝতে পারবে বাঙালি গিদ্ধর না সচেতন।

কিন্তু চিঠি লিখেও সেই চিঠি কিপলিংয়ের সঠিক ঠিকানা না জানায় সরলা দেবী ডাকে ছাড়তে পারেননি। চিঠি পাঠাতে না পারায় তিনি মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। মনকে শান্ত করতে পারছিলেন না। এই সময় তিনি কটকে এসেছিলেন। কটকে এসে দেশভক্ত মধুসূদন দাসের সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

সরলাদেবীর কাছ থেকে ঘটনার কথা এবং তাঁর লেখা চিঠির বয়ান শুনে মধুসূদনবাবু সরলা দেবীকে বলেছিলেন—"ওকে যখন পাঁচ বছর সময় দিয়েছেন, নিজেও পাঁচ বছর সময় অপেক্ষা করুন। এই সময়ের মধ্যে বাঙালি যুবকদের অস্ত্র বিদ্যায় তৈরি করে নিন।

"বাংলার যুবকদের সর্বতোভাবে সবরকম অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে পারলে তবেই তো আপনার পক্ষে বদলা নেওয়া সম্ভব হবে। আপনি দেখাতে পারবেন বাঙালিরা গিদ্ধর নয়। যুদ্ধের ময়দানে বাঙালিরা বুঝিয়ে দিতে পারবে তারা বিদেশিদের থেকে কোন অংশে ছোট নয়। বাঙালি যুবক-যুবতীকে তৈরি করে নেওয়ার পর কিপলিংকে চ্যালেঞ্জ পাঠাবেন। উত্তেজনার বশে কিছু করা ঠিক হবে না।"

মধুসূদন দাসের যুক্তি সরলাদেবীর মনে ধরেছিল। সরলাদেবীর বক্তব্য থেকে কি বোঝা যায় না—তিনি বাঙালি যুবকদের অস্ত্র চালানোর

পারদর্শিতার উপর যথেষ্ট বিশ্বাস রাখতেন। যদি কেবলমাত্র অহিংস আন্দোলনই তাঁর একমাত্র আদর্শ থাকবে তাহলে লিখেছিলেন কেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা। বলেছিলেন কেন মোকাবিলার আহ্বান জানিয়ে বন্দুক বা তলোয়ার ব্যবহারের কথা।

কলকাতায় ফিরে কাশিয়াবাগানের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সরলাদেবী উঠে এসেছিলেন ২৬নং সার্কুলার রোডে। সেখানে মুর্তাজা নামে একজন মুসলমান ওস্তাদকে নিযুক্ত করে বাঙালি যুবকদের শিক্ষা দিয়েছিলেন ছোরা খেলা, তরোয়াল চালানো, লাঠি খেলা। এই জন্য তিনি নিজের পয়সায় অস্ত্রশস্ত্র কিনে দিয়েছিলেন। অস্ত্র শিক্ষার জন্য একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল সরলাদেবীকে।

সরলাদেবী বলেছিলেন বাঙালি ছেলেরা অস্ত্রশিক্ষা নিত। আমি একপাশে একটি চেয়ারে বসে তাদের শিক্ষা নিতে দেখতাম। এই অস্ত্রশিক্ষার ক্লাবটির কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ায় দূর-দূরান্তের ছেলেরা সেখানে অস্ত্র শিক্ষা ও শরীর গঠনের জন্য আসতে শুরু করেছিল।

সরলাদেবী চৌধুরাণীর এই সব কাজকর্মের কথা শুনে ঢাকার 'অনুশীলন সমিতির' কর্ণধার সশস্ত্র বিপ্লবী সরলাদেবীর সাথে দেখা করার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন।

সরলা দেবী নানাভাবে বিপ্লবী সংগঠনকে সাহায্য করেছিলেন। এই জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হয়েছিল এই দেশপ্রেমিক মহিলাটিকে। মুর্তাজাকে এর পর থেকে একাধিক ক্লাবে গিয়ে ছেলেদের অস্ত্র শিক্ষা দিতে হত।

সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি যদি তাঁর বিরূপ মনোভাব থাকবে তাহলে অস্ত্র শিক্ষা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে যাবেন কেন? মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে—প্রত্যক্ষভাবে সেই সময় একজন নারীর পক্ষে সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। সব দিক বিবেচনা করে অহিংস আন্দোলনকে তাঁর বেছে নিতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি গান্ধীজির খুব কাছে এসেছিলেন।

যতদূর জানা যায়, ১৯০৩ সালে বিপ্লবী শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ সরলা

দেবীর প্রতিষ্ঠিত আপার সার্কুলার রোডের ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জিও ছিলেন সেই ক্লাবে। ক্লাবটি অবশ্য ১৯০৪ সালে উঠে যায়।

অশ্বারোহণ শিক্ষা দেওয়া ছিল ব্যয়বহুল ব্যাপার। এইজন্য শ্রীযতীন ব্যানার্জি বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আনতেন। একসময় ব্যারিস্টার পি মিত্র যতীনবাবুর পরিচালনায় বিপ্লবী সঙ্ঘের সভাপতি হয়েছিলেন। ব্যারিস্টার পি মিত্র বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ঢাকায় এসে বাঙালি যুবকদের ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করায় ১৯০৬/ ১৯০৭ সালে শ্রীবিপিনবিহারী দাস ঢাকায় তৈরি করেছিলেন অনুশীলন সমিতি।

এই অনুশীলন সমিতিকে বলা যায় পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সশস্ত্র বিপ্লবী দল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি একসময় সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁর নাম হয়েছিল নিরালম্ব স্বামী। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁর বিপ্লবী জীবন। এর আগে আলিপুর বোমা মামলায় যতীন্দ্রনাথকে দণ্ডিত হয়ে চারমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছিল।

সরলাদেবীর স্বামী রামভুজ দত্তচৌধুরী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক প্রবন্ধ লেখায় ব্রিটিশ সরকার নানাভাবে রামভুজ দত্তচৌধুরী ও সরলা দেবী চৌধুরীকে পীড়ন করেছিলেন।

১৯১১ সালে রামভুজ চোধুরী রাজদ্রোহের অভিযোগে যখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে জেলে ছিলেন তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিছুদিন বাদেই তাঁর মৃত্যু হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর সরলা দেবী মাহত্মা গান্ধীর সাথে নানা জায়গায় ঘুরেছিলেন অহিংস আন্দোলনের সেবিকা হিসেবে। এরপর তিনি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনগ্রহণ করেছিলেন।

সরলাদেবীর মতই স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর ভগিনী নিবেদিতা সশস্ত্র বিপ্লবীর নানাভাবে দেশের মুক্তি আন্দোলনে উদ্দীপ্ত করেছিলেন।

সরলা দেবী চৌধুরাণী বা ভগিনী নিবেদিতার মত মহিয়সী নারীরা পরোক্ষভাবে যে ভাবে সাহায্য করেছিলেন তা আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

সরলা দেবী চৌধুরাণী বা ভগিনী নিবেদিতা হয়ত অনেকের কাছে পরিচিত কিন্তু এদের মত একাধিক নারী সশস্ত্র বিপ্লবীদের পর্দার আড়ালে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাদের পরিচয় কিন্তু চিরদিন অজানাই থেকে যাবে।

এবার ফিরে আসা যাক সশস্ত্র বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদারের কথায়। উজ্জ্বলা মজুমদার কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উজ্জ্বলা মজুমদারের কথা অ্যান্ডার হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে আমার 'আদালতের আঙিনায়' বইটিতে সংক্ষেপে লিখেছিলাম।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারীদের কথা বলতে গিয়ে উজ্জ্বলা মজুমদারের বিপ্লবী জীবনের কথা না বলে পারা যায় না। উজ্জ্বলার কথা না লিখলে অসমাপ্ত থেকে যাবে সশস্ত্রে বিপ্লবে নারীর অবদান।

।। সাত ।।

৮ই মে ১৯৩৪। এই সময় অবিভক্ত বাংলার গভর্নর ছিলেন স্যার অ্যানড্রবসন। পরম বিক্রমশালী ব্যক্তি এবং যোগ্য ইংরেজ প্রশাসক। কলকাতার অ্যান্ডারসন হাউসটি বর্তমানে 'ভবানী ভবন' নামে পরিচিত। এই 'ভবানী ভবনে' বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সি-আই-ডি পুলিসের সদর কার্যালয়। এ ছাড়াও রয়েছে একাধিক অফিস। এখনও 'ভবানী-ভবন' না বলে 'অ্যান্ডারসন হাউস' বললে সাধারণ মানুষ বেশি ভাল ভাবে চেনেন।

১৯৩৪ সালের ৮ মে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল এসেছিলেন দার্জিলিঙের লেবং রেস কোর্সে। দার্জিলিংয়ে লেবং রেস কোর্সে আসবেন স্বয়ং গভর্নর অ্যান্ডারসন সাহেব তাই পুলিস ও প্রশাসন সব রকমের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন পাছে কোনরকম অঘটন ঘটে। গভর্নরের সম্মানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল লেবং বেস কোর্সে। বহু গণ্যমান্য আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত হয়েছিলেন লেবং রেস কোর্স ময়দানে। মাঠের প্রতিটি আনাচে-কানাচে পুলিসের লোকজনেরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। এ ছাড়াও ছিল একাধিক সাদা পোশাকের পুলিস।

সশস্ত্র বিপ্লবীদের সম্বন্ধে সবসময় একটা ভীতি থাকায় প্রচণ্ড সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল রেস কোর্সের মাঠে এবং মাঠের বাইরে। দার্জিলিং ছেয়ে গিয়েছিল পুলিসে-পুলিসে।

বেলা অনুমান সাড়ে তিনটে নাগাদ লেবং রেস কোর্সে এসে পৌঁছেছিলেন গভর্নর অ্যান্ডারসন। হইহই ব্যাপার। দৌড়ের ঘোড়াগুলিকে এনে রাখা হয়েছিল নির্দিষ্ট জায়গায়। লেবং রেস কোর্সে ঘোড়দৌড় দেখতেই উপস্থিত হয়েছিলেন অ্যান্ডারসন সাহেব।

স্যার অ্যান্ডরসনকে এনে বসানো হয়েছিল তাঁর জন্য বিশেষভাবে তৈরি আসনটিতে। বেশ সুন্দর পরিবেশ। কয়েক রাউন্ড ঘোড়দৌড়ও হয়ে গেল। সব ঠিকঠাক মতই চলছিল। স্যার অ্যান্ডারসন নিজের নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে সবকিছু উপভোগ করছিলেন।

হঠাৎ ঘটে গেল একটি সাংঘাতিক বিপর্যয়। একজন লোককে দেখা গেল প্রায় ১০ ফুট দূর থেকে স্যার অ্যান্ডানরসনকে লক্ষ্য করে তার হাতের

পিস্তল থেকে গুলি ছুড়ছে। অন্যদিক থেকে অপর একজন কেউ ফুট ছয়েক দূরত্ব থেকে একই ভাবে তার হাতের পিস্তল থেকে অ্যান্ডারসনের দিকে গুলি চালাচ্ছে।

স্যার অ্যান্ডারসনের পাশে থাকা লোকজনরা গুলির আওয়াজে হকচকিয়ে উঠেছিলেন। এই ধরনের ঘটনা প্রথম অবস্থায় কারো পক্ষে চিন্তা সম্ভব ছিল না।

সৌভাগ্যবশত একটি গুলিও গভর্নবের দেহ স্পর্শ করল না। সিকিউরিটির লোকজন ও পুলিস প্রশাসন সকলেই বিস্ময় বোধ করলেন লেবং রেস কোর্স মাঠের এই ধবনের ঘটনায়। এত কাছ থেকে গুলি করা সত্ত্বেও সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওযায় আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে গেলেন স্যার অ্যান্ডারসন। স্যার অ্যান্ডারসনের এই আশ্চর্যজনক বেঁচে যাওয়া ছিল অভাবনীয। খানিকটা বিহ্বলতার পব সকলেই বুঝতে পারলেন সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্যরাই স্যার অ্যান্ডারসনকে হত্যা করার জন্য গুলি ছুড়েছেন পরিকল্পনামাফিক।

ঘটনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে বলতেই হয়—বিপ্লবীদের ছোড়া গুলিতে নিশ্চয়ই স্যার অ্যান্ডারসনের মৃত্যুর ঠিকানা লেখা ছিল না। তা না হলে লেবং রেস কোর্স থেকে সেদিন নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কবরখানায়। দেহে গুলি না লাগায় অ্যান্ডারসন সাহেব ফিরে আসতে পেরেছিলেন নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

বিপ্লবীদের পরিকল্পনায় কোন ক্রটি ছিল না। এত কাছ থেকে ছোড়া গুলি স্যার অ্যান্ডরসনকে স্পর্শ না করায় বিস্ময় জেগেছিল বিপ্লবীদের মনে। এত কাছ থেকে নিক্ষেপ করা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে ভাবাই যায় না। স্যার অ্যান্ডারসনকে হত্যা করতে না পারায় বিপ্লবীদের এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। শুরু হল পুলিসের তরফে ব্যাপক তল্লাশি।

ব্রিটিশ প্রশাসন এই ধরনের ঘটনায় নিশ্চয়ই মনে করেছিল—পুলিসের ব্যর্থতা না হলে কোনমতেই লেবং রেস কোর্সে বিপ্লবীরা প্রবেশ করে গভর্নরের এত সামনে যেতে পারতেন না। এই ব্যর্থতা ঢাকতে ফুঁসে উঠেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন ও পুলিস। অপরাধীদের ধরার জন্য প্রশাসন ও পুলিসের পক্ষ থেকে ছোটাছুটি শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনের সকলের

কাছেই প্রশ্ন জেগেছিল কি ভাবে লেবং রেস কোর্সে গভর্নরের অত কাছাকাছি সশস্ত্র বিপ্লবীরা পৌঁছেছিল।

যদি স্যার অ্যান্ডারসন গুলি খেয়ে নিহত হতেন তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে ব্রিটিশ প্রশাসনের মান ইজ্জত রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠত।

যখন স্যার অ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হচ্ছিল সেই সময় লেবং রেস কোর্সে অ্যান্ডারসন সাহেবের আসনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মিস্ বেনলা হর্টন নামে এক মহিলা। একটি গুলি এসে লেগেছিল মিস হর্টনের পায়ে। বিহ্বলতা কেটে যেতেই অবস্থা বুঝতে পেরে কর্তব্যরত পুলিস অফিসাররা রাইফেলধারী দুই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করেছিলেন।

লেবং রেস কোর্সে স্যার অ্যান্ডারসনের একপাশের আসনে বসেছিলেন মিঃ ট্যান্ডি এবং বারোয়ারির রাজা সাহেব। স্যার অ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে যে দুই ব্যক্তি গুলি ছুড়ছিলেন তাঁদের দুজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মিঃ ট্যান্ডি ও বারোয়ারির রাজা সাহেব। মিঃ ট্যান্ডি ও রাজাসাহেবের উদ্দেশ্য ছিল বন্দুকধারীরা যেন কোনভাবে পালিয়ে যেতে না পারে। তাছাড়া তাদের এর পর সামান্য সুযোগ দিলে দুষ্কৃতীরা তৃতীয়বার নিশ্চয়ই গভর্নরকে লক্ষ্য করে তাঁর প্রাণনাশের জন্য গুলি ছুড়বে।

গভর্নর জোনরেল স্যার অ্যান্ডারসন সাহেবের যেন জীবনসংশয় না হয় তাই তাঁরা কালক্ষেপ করেননি তাঁকে বাঁচাতে।

দুর্ভাগ্য দু'জন সশস্ত্র বিপ্লবীই পুলিসের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। লেবং রেসকোর্স থেকে পালিয়ে যেতে পারলেন না। পুলিসের হাতে আহত দু'জনই ধরা পড়লেন। আহত দু'জনকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল স্থানীয় হাসপাতালে।

পুলিসের লক্ষ্য থেকে নির্দিষ্ট বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও স্যার অ্যান্ডারসন হত্যা প্রচেষ্টার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হল।

ঘটনার পরের দিন অথবা তার পরের দিন আহত ব্যক্তিদ্বয় পুলিসের কাছে জবানবন্দি দিয়েছিলেন। পরে তাঁরা স্বীকারোক্তি করেছিলেন

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। আহত ব্যক্তিদ্বয়ের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গিয়েছিল—তাদের পরিকল্পনা ছিল লেবং রেসকোর্সে গুলি করে স্যার অ্যান্ডারসনকে হত্যা করা। আরো জানা গিয়েছিল তাঁরা দু'জনই বিপ্লবী দলের সদস্য। পূর্বপরিকল্পনামতই তাঁরা ঘটনার দিন নানা কৌশলে লেবং রেসকোর্সে প্রবেশ করে গভর্নরের কাছাকাছি জায়গা করে নিয়েছিলেন এবং সময়মত রিভলভার থেকে স্যার অ্যান্ডারসনকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়েছিলেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁদের পরিকল্পনা ফলবতী হয়নি। বেঁচে গেলেন বাংলার গভর্নর জেনারেল।

এই বন্দি আহত ব্যক্তিদ্বয়ের কাছ থেকে জানা গিয়েছিল স্যার অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে কারা কারা যুক্ত ছিলেন।

তদন্তকারী পুলিস অফিসাররা ষড়যন্ত্রকারীদের নাম জানার পর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে। জানা গিয়েছিল স্যার অ্যান্ডারসন হত্যা অপারেশনের সাথে যুক্ত ছিলেন মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ওরফে নরেশ চৌধুরী। যুক্ত ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী নারী উজ্জ্বলা মজুমদার ওরফে অমিয়া ওরফে মলয়া ওরফে মলিনা ওরফে লীলা। অর্থাৎ উজ্জ্বলা মজুমদার প্রয়োজনে একাধিক ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন দলের নির্দেশে। এ ছাড়া ছিলেন শ্রীমধুসূদন ব্যানার্জি ওরফে অমিয় ব্যানার্জি ওরফে সুনীল সেন, সুকুমার ঘোষ ওরফে লাল্টু, শ্রীভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ওরফে সমরজিৎ ব্যানর্জি, শ্রীসুশীল কুমার চক্রবর্তী ওরফে অজিতকুমার ধর।

সাতজন বিপ্লবীকেই পুলিসের হাতে বন্দি হতে হয়েছিল।

স্যার অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে উজ্জ্বলাকে বিশেষ ভূমিকা নিতে হয়েছিল।

বন্দি হওয়ার পর মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ও উজ্জ্বলা মজুমদারকে পুলিসের দ্বারা নিদারুণ ভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছিল। সেই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলা তদন্তকালীন অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ও উজ্জ্বলা মজুমদার।

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে করা স্বীকারোক্তিগুলি মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ।

মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণ শুরু হতে উজ্জ্বলা মজুমদার তাঁর পূর্বে দেওয়া স্বীকারোক্তি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পুলিসের অত্যাচারে ও প্ররোচনায় তাঁকে মিথ্যে বিবরণ দিয়ে স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পুলিসের শেখানো কথা বলতে হয়েছিল অত্যচার সহ্য করতে না পেরে তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তি ভিত্তিহীন।

মনোরঞ্জন ব্যানার্জিও মূল মামলা শুরু হতে লিখিতভাবে আদালতকে বলেছিলেন তার পূর্বে দেওয়া স্বীকারোক্তির মধ্যে অনেক জায়গায় সংশোধন প্রয়োজন। কারণ তাঁর স্বীকারোক্তির মধ্যে নানা জায়গায় ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন না করলে মামলায় তাঁর স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে না। মনোরঞ্জন ব্যানার্জি তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তির নানা জায়গায় অস্বীকার করেছিলেন। পরে হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন —স্বীকারোক্তি করা উজ্জ্বলা বা মনোরঞ্জনের পক্ষে উচিত হয়নি।

স্যার অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলাটিকে বিচারের জন্যে পাঠানো হয়েছিল একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে। অভিযুক্ত পূর্বে উল্লেখিত সাত জন বিপ্লবী। এই ষড়যন্ত্র মামলাটির শুনানি হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাটির শুনানি চলেছিল বেশ কয়েক সপ্তাহ একনাগাড়ে।

স্যার অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলাটি সাধারণের কাছে পরিচিত ছিল লেবং আউটরেজ (LEBONG OUTRAGE) নামে।

স্পেশাল ট্রাইবুনাল মামলাটির রায় দিয়েছিলেন ১৯৩৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। উজ্জ্বলা মজুমদার-সহ সব ক'জন অভিযুক্তকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কারণ স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচার-বিবেচনায় সব অভিযুক্তকেই হত্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

সব ক'জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করার পর ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং মনোরঞ্জন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। এই তিনজনের বিরুদ্ধে বে-আইনিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগও ছিল। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিবেচনায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত এই তিন বিপ্লবী ছিলেন অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রের নায়ক।

বিপ্লবী দলটির একমাত্র মহিলা সদস্যা উজ্জ্বলা মজুমদার ছিলেন লেবংকোর্সে অপারেশনের সময় মাত্র উনিশ বছরের একটি যুবতী।

উজ্জ্বলার বিরুদ্ধে সরকারপক্ষের অভিযোগ ছিল ষড়যন্ত্রের এবং আগ্নেয়াস্ত্র রাখার। সরকারপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এই বিপ্লবী মেয়েটি ভারতবর্ষের মাটি থেকে ব্রিটিশ সরকারকে বিতাড়ন করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। স্পেশাল ট্রাইবুনাল উজ্জ্বলা মজুমদারকে যাবজ্জীবন .সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। বিপ্লবী মধুসূদন ব্যানার্জিকে দেওয়া হয়েছিল ১৪ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড। তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল ষড়যন্ত্রের এবং আগ্নেয়াস্ত্র হেফাজতে রাখার। সুকুমাব ঘোষকেও দেওয়া হয়েছিল একই অভিযোগে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

বিপ্লবী সুশীলকুমার চক্রবর্তীকে স্পেশাল ট্রাইবুনাল দোষী সাব্যস্ত করলেও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

হলফ নিয়ে বোধ হয় বলা যায়—হালফিলের রাজনীতির সাথে যুক্ত বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতৃত্ব—ক্ষুদিরাম বসু, সূর্য সেন, সত্যেন বসু, দীনেশ গুপ্ত বা ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির কথা জানলেও তাঁরা বোধহয় জানেন না দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসির দড়িতে গলা দিতে হয়েছিল রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, তারকেশ্বর দস্তিদার, রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ভবানী ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ব্যানার্জিকে।

নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানেননা কাকরী ষড়যন্ত্র মামলার কথা। উত্তর ভারতে ১৯২৫ সালে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আনা মামলাটির নামকরণ হয়ে গিয়েছিল "Revolutionary Conspiracy Case."

এই কাকরী ষড়যন্ত্র মামলায় ১৮ জন বিপ্লবীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এই দোষী সাব্যস্ত করা ১৮ জন বিপ্লবীর মধ্যে বিপ্লবী রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও রাউসন সিংকে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড।

লক্ষ্ণৌ ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবী সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীকেও দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। ফাঁসির আসামী হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নিয়েছিলেন।

মৃত্যুদণ্ডের আলোচনায় অবতীর্ণ হতে হল বলে এই সব মহান সশস্ত্র বিপ্লবীদের নাম উল্লেখ করতে হল। যদিও আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারীর ভূমিকা।

সশস্ত্র বিপ্লবীদের কথা আলোচ্য বিষয় বলে অহিংস আন্দোলনের সাথে যুক্ত মাতঙ্গিনী হাজরা, বীণা ভৌমিক, সরলা দেবী, বাসন্তী দেবী এবং বহু অহিংস বিপ্লবীদের কথা এই ক্ষেত্রে টানা হল না।

অহিংস আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিপ্লবী নারীদের কথা বলতে গেলে আলাদা পরিসর প্রয়োজন। সুযোগ পেলে সেই সব মহান বিপ্লবী নারীদের কথা বলা যাবে।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলে হাইকোর্টের অনুমোদন প্রয়োজন। সেইজন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠিয়ে দিতে হয় নির্দিষ্ট হাইকোর্টে। হাইকোর্ট থেকে অনুমোদন পেলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকারী করা হয়। হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন না করা পর্যন্ত ফাঁসির আসামীদের রাখতে হয় জেলের আলাদা সেলে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে যেসব মহান বিপ্লবীরা ফাঁসিকাঠে ঝুলেছিলেন হাসতে হাসতে তাদের উদ্দেশ করেই কি লেখা হয়েছিল :—

বন্ধু আজকে বিদায়।
দেখেছ উঠল যে হাওড়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইল,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা কোরো।

দিল্লি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন বিপ্লবী অবোধ বিহারী, আমীর চাঁদ, বালমুকুন্দ এবং বসন্তকুমার বিশ্বাস। ১৯১৪ সালে এদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বোধহয় তারিখটি ছিল ৫ অক্টোবর। এ ছাড়াও হয়ত অজানা বিপ্লবী দলের অনেক সদস্যকে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য যে সব মহান বিপ্লবীরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন অথচ তাদের নাম আজও অজানাই থেকে গিয়েছে তাদের নাম খুঁজে বার করে একটি সমগ্র ইতিহাস তৈবিব প্রয়োজনীয়তার কথা আজও কেউ বোধ করলেন না। স্বাধীন ভারতের নেতৃত্বের কী এই প্রয়োজনীয় দিকটা ভেবে দেখা উচিত ছিল না?

সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। বলছিলাম অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে উজ্জ্বলা মজুমদারের ভূমিকার কথা।

স্যার অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত আসামীরা স্পেশাল ট্রাইবুনালের দেওয়া দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। অবশ্য দণ্ডিত আসামী সুশীল চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে কোন আপিল দায়ের করা হয়নি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়—মামলার নথিপত্র থেকে দেখা গিয়েছিল লেবং রেসকোর্সে স্যার অ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে রিভলভার থেকে গুলি ছুড়েছিলেন ভবানী ভট্টাচার্য এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। দুজনের নিশানাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন বাংলার গভর্নর স্যার অ্যান্ডারসন। এই ঘটনায় সমগ্র দেশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এত সুরক্ষার ব্যবস্থার পরও সশস্ত্র বিপ্লবীরা যদি খোদ গভর্নরের এত কাছে গিয়ে গুলি করে তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টা নিতে পারেন, তখন তাদের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়, পুলিস প্রশাসন নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য হয়েছিল লেবং রেসকোর্সের এই ঘটনার পরে।

মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীরা কেবলমাত্র শাস্তির মেয়াদের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন। সমগ্র শাস্তির বিরুদ্ধে তাদের কোন বিরোধিতা ছিল না। ভবানী ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ব্যানার্জি এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বক্তব্য ছিল তাদের বিরুদ্ধে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঠিকমত দেওয়া হয়েছিল কি না তা যেন হাইকোর্ট বিচার-বিবেচনা করে দেখেন।

মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামী তিনজনের জন্য কলকাতা হাইকোর্টে সওয়াল করেছিলেন তদানীন্তনকালের প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীসুধাংশুশেখর মুখার্জি, শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীসুরেশচন্দ্র তালুকদার, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত এবং ফরাৎ আলী। অন্যদিকে উজ্জ্বলা মজুমদার, মধুসূদন ব্যানার্জি এবং সুকুমার ঘোষ তাঁদের পক্ষে কোন আইনজীবী নিযুক্ত করতে না পারায় আপিল বেঞ্চের অনুরোধে শ্রীসুধাংশুশেখর মুখার্জি এবং সুরজিৎ লাহিড়ী বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের হয়ে হাইকোর্টে লড়েছিলেন।

বিনা পারিশ্রমিকে উজ্জ্বলা, মধুসূদন ও সুকুমারের হয়ে এই দুই

আইনজীবী সওয়াল করায় কলকাতা হাইকোর্ট এই দুই আইনজীবীর ভূয়সী প্রশংসা কবেছিলেন রায় লিখতে বসে। এমনকি কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত জানাতে কসুর করেননি।

মামলার নথিপত্র থেকে দেখা গিয়েছিল ১৯৩২ সালে উজ্জ্বলা মজুমদারের পিতৃদেব সুরেশ মজুমদারের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন উজ্জ্বলা ও তার ছোটভাই গোপাল। উজ্জ্বলার মায়ের মৃত্যুর পর সুরেশবাবু দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেছিলেন। উজ্জ্বলার সৎ মা উজ্জ্বলার থেকে বয়সে মাত্র বছর দুয়েকের বড় ছিলেন। সুরেশ মজুমদার কলকাতায় ব্যবসা করতেন। তাছাড়া তার বেশ কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল। ব্যবসার জন্য নানা জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হত। সুরেশবাবু সব সময় ঢাকায় থাকতে না পারায় ছেলেমেয়েদের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেননি।

১৯৩২ সালে উজ্জ্বলা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করেছিলেন কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে তার সাহায্যের প্রয়োজন হওয়ায় সুরেশবাবু মেয়ের জন্য একজন উপযুক্ত প্রাইভেট টিউটরের অনুসন্ধান ছিলেন। সুকুমার ঘোষ (পরে দণ্ডিত আসামী) উজ্জ্বলাকে পড়াতে রাজি হলেও সুরেশবাবু সম্মত হতে পারছিলেন না। এর প্রধান কারণ ছিল সুকুমার ঘোষ ভাল সংস্কৃত জানতেন না। সুরেশবাবুর ইচ্ছে ছিল উজ্জ্বলা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সব বিষয়ে ভাল ফল করে। এই অবস্থায় সুরেশবাবু সুকুমার ঘোষকে নিযুক্ত না করে নিযুক্ত করেছিলেন মধুসূদন ব্যানার্জিকে। (পরে মধুসূদন ব্যানার্জিও দণ্ডিত হয়েছিলেন)।

সুকুমারের পরামর্শেই মধুসূদন ব্যানার্জিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল উজ্জ্বলাকে পড়াবার জন্য। কিন্তু যে কারণেই হোক মধুসূদন ব্যানার্জি তাঁর আসল নাম লুকিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন অমিয় ব্যানার্জি নামে। মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ছিলেন মধুসূদন ব্যানার্জির ভাই। সুরেশবাবুর পরিবারের সাথে মনোরঞ্জনের খুব ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। সুরেশবাবুর পরিবারের লোকজন মনোরঞ্জনকে জানত 'নরেশ' নামে।

প্রাইভেট টিউটর মধুসূদনের কাছে উজ্জ্বলা পড়েছিলেন মাস দুয়েক। যে কোন কারণেই হোক উজ্জ্বলার প্রাইভেট টিউটর মধুসূদন ব্যানার্জি

নিয়মিতভাবে উজ্জ্বলাকে পড়াতে আসতে পারতেন না। অনিয়মিতভাবে পড়াতে আসতেন বলে উজ্জ্বলার পিতৃদেব সুরেশবাবু মধুসূদন ব্যানার্জিকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল—গৃহশিক্ষক হিসেবে মধুসূদন ব্যানার্জিকে ছাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই তিনি মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ও সুকুমার ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি উজ্জ্বলাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। প্রথম দিকে অবশ্য সুরেশ মজুমদার তাঁর বাড়িতে এই তিনজনের যাতায়াতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করেননি।

১৯৩৩ সালে সুরেশবাবু খুব মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করেছিলেন — তাঁর কন্যা উজ্জ্বলা খুব মনোযোগের সাথে দুটি বই সব সময় অন্যের অগোচরে পড়ত। অনুসন্ধানে তিনি জানতে পারলেন বই দুটি ছিল 'বিপ্লবী বই'। নানা ধরনের বিপ্লবী কথা ছিল বই দুটিতে। সুরেশবাবু ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন উজ্জ্বলা এই ধরনের বই পড়ায়।

সুরেশবাবু মেয়ের এই ধরনের বই পড়া মেনে নিতে না পারায় একদিন উজ্জ্বলাকে প্রশ্ন করেছিলেন—এই সব বিপ্লবী বই সে কার কাছ থেকে পেয়েছে? উত্তরে উজ্জ্বলা তার বাবাকে বলেছিলেন—তার মাস্টারমশাই মধুসূদন ব্যানার্জি তাকে বই দুটি পড়তে দিয়েছিলেন। উজ্জ্বলার উত্তর শুনে সুরেশবাবু মেয়ের উপর রাগান্বিত হয়ে বই দুটি নিজের হেফাজতে নিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি মেয়েকে বলেছিলেন মধুসূদন ব্যানার্জির পক্ষে কখনই উচিত হয়নি ছাত্রীকে এই ধরনের বই পড়তে দেওয়া।

সুরেশবাবু উজ্জ্বলাকে বলে দিয়েছিলেন—সে যেন মধুসূদনবাবুকে তাদের বাড়িতে যাতায়াত করতে বারণ করে দেয়। মধুসূদনবাবুর সাথে উজ্জ্বলাকে কোন রকম সম্পর্ক রাখতেও নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

এর কিছুদিন বাদেই সুরেশবাবু নিজের ব্যবসার কাজে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। সুরেশবাবু যখন ঢাকার বাইরে থাকতেন তখন নিয়মিত মধুসূদন ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ও সুকুকমার ঘোষ আগের মতই উজ্জ্বলাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন এবং উজ্জ্বলার সাথে গুপ্তভাবে শলাপরামর্শ করতেন। সুরেশবাবুর অবশ্য জানা ছিল না পরবর্তীকালে ওদের তাঁর বাড়িতে এই যাতায়াতের খবর।

পরে অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রের মামলার নথি থেকে এবং মধুসূদন ও মনোরঞ্জনের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গিয়েছিল—মধুসূদন, মনোরঞ্জন এবং সুকুমার ওরফে লাল্টু ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য। তাঁরা বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র বিপ্লব। তাঁদের মন্ত্র ছিল পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলাদের খতম করা।

মধুসূদন ও মনোরঞ্জন অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করানো সম্ভব হয়নি। সুকুমার স্বীকারোক্তি করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। সুকুমারের নিজের মুখ থেকে পুলিস কোন কথাই বার করতে পারেনি।

উজ্জ্বলা মজুমদার কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই জানতেন—মধুসূদন ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন ব্যানার্জি এবং সুকুমার ঘোষ সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সাথে ভীষণভাবে যুক্ত। তাঁদের বিপ্লবী মন্ত্রের কথাও উজ্জ্বলার জানা ছিল।

ফিরে আসা যাক উজ্জ্বলা ও তার ভাই গোপালের জীবনযাত্রার কথায়। ১৯৩৩ সালে ভাই বোন দু'জনেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসেছিলেন এবং সসম্মানে দু'জনেই ম্যাট্রিকুশেন পরীক্ষায় পাস করেছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করার পর ভাই বোন দু'জনেই সশস্ত্র বিপ্লবের কাজকর্মের সাথে নিজেদের যুক্ত করে ফেলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা বিপ্লবী দলের সদস্যপদ পেয়েছিলেন। এরপর দলের নির্দেশমত সব কাজকর্ম করে যাচ্ছিলেন। বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন ভাই-বোন দু'জনেই। কোন কিছুতেই তাদের ভীতি ছিল না।

মার্চের শেষাশেষি কিংবা এপ্রিলের প্রথম দিকে সুকুমারের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল বিপ্লবী দলের সদস্য পৃথ্বীশের সাথে। সুকুমার ও পৃথ্বীশ মিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে তারা ইংরেজদের জীবন শেষ করে দেবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথ্বীশকে বিশেষ কাজের ভার দিয়ে শিলং পাঠানো স্থির হয়েছিল। যে কোন কারণেই হোক পৃথ্বীশকে শেষ পর্যন্ত শিলং পাঠানো সম্ভব হয়নি।

কিছু কিছু ব্যাপার থেকে পরে মনে হয়েছিল কোন বিষয় নিয়ে পৃথ্বীশের সাথে সুকুমারের মনের মিল না হওয়ায় পৃথ্বীশ নিজেকে দলের কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে তার কোন এক আত্মীয়র বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। পৃথ্বীশ

এইভাবে চলে যাওয়ায় সুকুমার তার শিলং যাত্রার পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আবারও আমরা ফিরে যাই উজ্জ্বলার ব্যাপারে। এপ্রিলের প্রথম দিকে যথাসম্ভব গুপ্তভাবে মধুসূদন, মনোরঞ্জন ও সুকুমার উজ্জ্বলাদের বাড়িতে গিয়ে শলাপরামর্শ করতে শুরু করেছিল। ঢাকার অনেক লোকই দেখেছিলেন সুরেশবাবুর অনুপস্থিতিতে উজ্জ্বলার সাথে মধুসূদন, মনোরঞ্জন এবং সুকুমারের যোগাযোগ।

ঢাকায় উজ্জ্বলাদের বাড়ির ছাদে বসে নানা গুপ্ত আলোচনা চলত উজ্জ্বলার সাথে মধুসূদন, মনোরঞ্জন ও সুকুমারের। উজ্জ্বলার ভাই গোপালও স্বীকার করেছিলেন এই সব ঘটনার কথা। গুপ্ত আলোচনার সময় বাইরের কোন লোককে ওদের কাছে যেতে দেওয়া হত না।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় উজ্জ্বলা মজুমদারের ভাই গোপাল স্পেশাল ট্রাইবুনালে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন সরকার পক্ষের হয়ে। গোপাল অবশ্য তার সাক্ষ্য নিজেই স্বীকার করেছিলেন—একসময় তিনিও বিপ্লবী দলে ছিলেন। নাবালক অবস্থায় তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। ভাল-মন্দ বোঝার মত তখন তার ক্ষমতা ছিল না। তার দল তাকে কোনদিনই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেয়নি।

গোপালের সাক্ষ্য থেকে বোঝা গিয়েছিল গোপালের উপর দলের বিশ্বাস না থাকলেও গোপালের দিদি উজ্জ্বলাকে দল বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিল। অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রের মধ্যে উজ্জ্বলাকে রাখা হয়েছিল। উজ্জ্বলা সমগ্র পরিকল্পনার কথা আগে থেকে বেশ ভালভাবে জেনেই দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলেন। লেবং কোর্স অপারেশনের ব্যাপারে উজ্জ্বলার খুবই আগ্রহ ছিল। উজ্জ্বলাকে দেওয়া হয়েছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সম্ভবত ৩ মে মনোরঞ্জনের সাথে ঢাকা থেকে কলকাতা এসেছিলেন উজ্জ্বলা। উজ্জ্বলা যখন কলকাতায় এসেছিলেন সেই সময় তার পিতৃদেব সুরেশ মজুমদার ছিলেন ঢাকায়। কলকাতায় উজ্জ্বলার পক্ষে বেশিদিন থাকা সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া সুরেশবাবুর পক্ষে কিছুই জানা সম্ভব ছিল না তার ছেলে মেয়ে দু'জনই কেন কলকাতায় হঠাৎ চলে গিয়েছিল।

নানাদিক চিন্তা করে ঢাকায় সুরশেবাবুর কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। টেলিগ্রামে লেখা হয়েছিল কলকাতায় তাঁর ছেলে হঠাৎ বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

এই টেলিগ্রাম পেয়ে সুরেশবাবু এসে পৌছেছিলেন কলকাতায়। কিন্তু সুরেশবাবু এসে দেখলেন গোপাল মোটেই অসুস্থ নয়।

ছেলে মেয়ে দু'জনেই বাবাকে জানালো তারা ভাই বোন কয়েকদিনের জন্য তাদের আত্মীয়া ননীবালা দেবীর বাড়িতে বেড়াতে যেতে চায়। সুরেশ ছেলে মেয়ের এই আবদার অনুরোধ মেনে নিয়ে নিজে ঢাকা ফিরে গিয়েছিলেন।

সুরেশবাবু অবশ্য এক কথায় ছেলে মেয়ের আবদার অনুরোধ শুনে মনে করেছিলেন ননীবালার বাড়িতে পরীক্ষার পরে কয়েকদিনের জন্য ঘুরে আসলে দোষ কি। তাই তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। বাবার অনুমতি পাওয়ার পর উজ্জ্বলা ও গোপাল বেরিয়ে পড়েছিলেন। ননীবালার বাড়িতে না গিয়ে উজ্জ্বলা এসেছিলেন মনোরঞ্জনের সাথে তাদের বিপ্লবী ডেরায়। অন্যদিকে গোপালকে নিয়ে মধুসূদন এসেছিল তাঁর দেশের বাড়িতে। মধুসূদনের দেশের বাড়ি ছিল 'হাসাইলে'। সেখানেই গোপালকে রাখা হয়েছিল সাময়িকভাবে।

মনোরঞ্জনের সাথে যখন উজ্জ্বলা আসছিলেন তখন মনোরঞ্জন একটি বিশেষ পরিকল্পনার কথা উজ্জ্বলাকে জানিয়ে ছিলেন। উজ্জ্বলা বিস্তারিত ভাবে মনোরঞ্জনের কাছ থেকে পরিকল্পনাটি জানতে চাওয়ায় মনোরঞ্জন উজ্জ্বলাকে বলেছিলেন—তাদের উদ্দেশ্য বাংলার তদানীন্তন গভর্নর জেনারেলকে গুলি করে হত্যা করা। সব পরিকল্পনার কথা শুনে উজ্জ্বলা সায় দিয়েছিলেন এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে।

কলকাতার একটি গুপ্ত স্থানে একদিনের জন্য উজ্জ্বলাকে রাখা হয়েছিল দার্জিলিং যাওয়ার আগে।

পরের দিন মনোরঞ্জন একটি ট্যাক্সিতে করে শিয়ালদহ রেল স্টেশনে পৌছেছিলেন। শিয়ালদহ আসার সময় ট্যাক্সিতে দুটো বড়ো সুটকেস দেখতে পেয়েছিলেন উজ্জ্বলা। উজ্জ্বলা মনোরঞ্জনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন

সুটকেস দুটিতে কি আছে। মনোরঞ্জনের উত্তর ছিল—বিশেষ কিছু জিনিস আছে। মনোরঞ্জন বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর উত্তরে উজ্জ্বলা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তখন রাখঢাক না রেখে উজ্জ্বলাকে জানানো হয়েইছল—সুটকেস দুটি ভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র আছে। সুতরাং তাদের খুব সমঝে চলতে হবে। এই আগ্নেয়াস্ত্রই ব্যবহার করা হবে স্যার অ্যান্ডারসনকে হত্যা করতে। এই উদ্দেশ্যেই তাদের দার্জিলিং যাত্রা। মনোরঞ্জনের বক্তব্য শুনে উজ্জ্বলা প্রথমটায় খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন কাজটি সাংঘাতিক ধরনের। ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড।

মনোরঞ্জন উজ্জ্বলাকে বলেছিলেন—খুব সতর্কতার সাথে তাদের কাজটি করতে হবে। দার্জিলিং স্টেশনে নামার পর সুটকেস দুটি তল্লাশি হতে পারে। তাই উজ্জ্বলাকে নিতে হবে সুটকেস দুটি। কোন মহিলার হাতে সুটকেস দেখলে তল্লাশি নাও হতে পারে। মনোরঞ্জনের দৃঢ় ধারণা ছিল—উজ্জ্বলার মত মহিলা সাথে থাকলে তাদের পক্ষে পুলিসের তল্লাশি এড়ানো সম্ভব হবে। তাছাড়া কোন পুরুষের সাথে মহিলা থাকলে পুলিসের সন্দেহ এমনিতেই কম হয়।

তাছাড়া উজ্জ্বলাকে বলে দেওয়া হয়েছিল কুলির মাথায় সুটকেস দিয়ে দেওয়া হবে। যদি কোন কারণে সুটকেস দুটি তল্লাশি করা হয় তাহলে উজ্জ্বলা পুলিসকে বলবেন সুটকেস দুটি তাঁদের নয়। অর্থাৎ সুটকেস্ দুটি সম্বন্ধে তাঁর কিছু জানা নেই।

এরপরে দার্জিলিং স্টেশনে নামার পর সত্যি সত্যি কোন তল্লাশি না হওয়ায় মনোরঞ্জন উজ্জ্বলাকে নিয়ে উঠেছিলেন 'স্নো-ভিউ' হোটেলে। দার্জিলিং স্টেশনে হঠাৎ উজ্জ্বলার সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল একজন আত্মীয়ের, মনোরঞ্জনের সাথে উজ্জ্বলাকে দেখে আত্মীয়টির চোখেমুখে একটা সন্দেহের ভাব দেখা গিয়েছিল। 'স্নো-ভিউ' হোটেলে উজ্জ্বলার পরিচয় ছিল মনোরঞ্জনের স্ত্রী হিসাবে।

এই প্রসঙ্গে পরে মামলার রায়ে মন্তব্য করা হয়েছিল—হোটেলের একটি ঘরে উজ্জ্বলাকে নিয়ে মনোরঞ্জন থাকায় অনেকেই একটা ধারণা করেছিলেন উজ্জ্বলাকে নিয়ে মনোরঞ্জন আনন্দ উপভোগ করার একটা সুযোগ পেয়েছিলেন। যদিও এই ধরনের ধারণার সত্যি-মিথ্যে কোনভাবেই প্রমাণিত

হয়নি। অন্যদিক থেকে বিচার-বিবেচনা করলে বোঝা যায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে যদি উজ্জ্বলাকে নিয়ে মনোরঞ্জন হোটেলের একটি ঘর ভাড়া নিয়ে না থাকতেন তাহলে অনেকেই তাদের সন্দেহ করতেন। এমনকি তাদের উপর পুলিসের দৃষ্টি পর্যন্ত পড়তে পারত। স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে "স্নো-ভিউ" হোটেলে থাকায তাদেব পক্ষে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়িত করতে অনেক সুবিধা হয়েছিল। মনোরঞ্জন এবং উজ্জ্বলা যখন স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে "স্নো-ভিউ" হোটেলে ছিলেন সেই সময় দুজন যুবক তাদের সাথে দেখা কবতে ঘন ঘন হোটেলে যাতাযাত কবতেন। পরবর্তীকালে আদালতে এই দুই যুবককে শনাক্ত করা হয়েছিল। এই দুই যুবক ছিলেন ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র ব্যানার্জি। সাক্ষ্য থেকে বোঝা গিয়েছিল ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র ব্যানার্জি শলাপরামর্শ করতে গিয়েছিলেন 'স্নো-ভিউ' হোটেলে মনোবঞ্জন ব্যানার্জি এবং উজ্জ্বলা মজুমদারের সাথে।

ভাবা যায় একটি শিক্ষিতা যুবতী সেই সময় দেশের মুক্তি আন্দোলনে নির্ভয়ে দলের সব পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিলেন নিঃস্বার্থভাবে। পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে মনোরঞ্জনকে স্বামী হিসেবে পরিচয দিতেও দ্বিধা করেননি।

রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন—সেই স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেছিলেন—তিনি ও ভবানী যখন 'স্নো-ভিউ' হোটেলে মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলার সাথে দেখা করতে যেতেন, সেই সময় একদিন মনোরঞ্জন ভবানীর হাতে ১টি অটোমেটিক পিস্তল, ১টি রিভলভার এবং কিছু আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি দিয়েছিলেন। ভবানী ও রবীন্দ্র দার্জিলিংয়ে উঠেছিলেন "স্যানোটারিয়াম" নামে একটি হোটেলে। ভবানী মনোরঞ্জনের দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি এনে রেখেছিলেন "স্যানোটরিয়ামে"।

পূর্ববন্দোবস্তমতই 'স্নো-ভিউ' হোটেলে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলাকে রাখা হয়েছিল আর ভবানী ও রবীন্দ্র উঠেছিলেন স্যানেটরিয়াম হোটেলে। কিন্তু সুযোগমত তারা একসাথে বসে আলাপ-আলোচনা করতেন 'স্নো-ভিউ' হোটেলে মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলার হোটেলের ঘরটিতে।

দার্জিলিং আনা বিপ্লবীদের অস্ত্রগুলির বেশির ভাগই ছিল উজ্জ্বলার হেফাজতে, এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও 'স্নো-ভিউ' হোটেলে থাকার সময় আগ্নেয়াস্ত্র রাখার বিপদ সম্বন্ধে মনোরঞ্জনের মধ্যে কেন যেন বিশেষ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়নি। বরং এই ব্যাপারে তিনি ছিলেন ভীষণভাবে উদাসীন। মনোরঞ্জনের এই ধরনের উদাসীনতা কোন বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্যর কাছ থেকে আশা করা যায়নি। এত বড় অপারেশনের দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ে—তাই মনোরঞ্জনের মত দায়িত্বশীল সশস্ত্র বিপ্লবীর কাছ থেকে যথেষ্ট সচেতনতা আশা করা হয়েছিল।

এই সময় একদিন মনোরঞ্জন, উজ্জ্বলা, ভবানী ও রবীন্দ্র একসাথে বসে যুক্তি পরামর্শ করে ঠিক করেছিলেন—পরের দিনবাংলার গভর্নর জেনারেল স্যার অ্যান্ডারসন বিকেলের দিকে "ফ্লাওয়ার শো" দেখতে যাবেন একটি নির্দিষ্ট জায়গায়, তখন সেখানে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে হত্যা করা হবে। ঠিক হল গভর্নরের উদ্দেশে গুলি ছুড়বেন ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। সেইমত নির্দিষ্ট স্থানে হাজির থাকতেও বলা হল ভবানী ও রবীন্দ্র দুজনেই গভর্নরকে চিনতেন না। শনাক্ত করে না দিলে ভবানী ও রবীন্দ্রর পক্ষে অ্যান্ডারসন সাহেবকে চেনা সম্ভব ছিল না। চিনতে না পারলে কাকে লক্ষ্য করে গুলি করবেন দায়িত্ব পাওয়া দুই বিপ্লবী। তাই এই পরকল্পনা বিপ্লবীদের পরিত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

এই ব্যাপারে আলোচনা করার সময় মনোরঞ্জন ব্যানার্জি নিজেই বলেছিলেন—স্যার অ্যান্ডারসন সব সময় একটি বড় আকারের ঘোড়ায় চাপেন। ঘোড়া দেখেই বোঝা যায় কোনটি গভর্নর জেনারেলের ঘোড়া। তাছাড়া পরের মনোরঞ্জন নিজেই যাবেন 'ফ্লাওয়ার শো' দেখতে। তখন আড়াল থেকে তিনি ভবানী ও রবীন্দ্রকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্যার অ্যান্ডারসনকে চিনিয়ে দেবেন।

পরের দিন 'ফ্লাওয়ার-শো' আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন নির্দিষ্ট স্থানে ভবানী ও রবীন্দ্র। তাঁরা টিকিট কিনতে গিয়ে জানতে পারলেন তখন পর্যন্ত টিকিট বিক্রয় শুরু হয়নি। টিকিট দিতে দেরি হবে। এই অবস্থায় সময় কাটাবার জন্য ভবানী ও রবীন্দ্র কাছাকাছি, একটি

পার্কে ঢুকেছিলেন। হঠাৎ তাঁদের নজর পড়ল সামান্য দূরে পার্কের একটি জায়গায় মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা বসে গল্পগুজব করছেন। কিছুক্ষণ বাদে কোন সংকেত না দিয়েই মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা পার্কটি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় ভবানী ও রবীন্দ্রর পক্ষে পরিকল্পনামাফিক কিছু করা সম্ভব ছিল না। তাঁরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন নিজেদের হোটেলে। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছিল মনোরঞ্জন উজ্জ্বলাকে নিয়ে 'ফ্লাওয়ার-শো' দেখতে ঢুকেছিলেন। স্যার অ্যান্ডারসনকে শনাক্ত করাতে যাতে সুবিধা হয় এই রকম জায়গা বেছে নিয়েই তাঁরা বসেছিলেন। কিন্তু স্যার অ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে গুলি করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ভবানী ও রবীন্দ্রর উপর। তাঁরা ইত্যবসরে চলে যাওয়ায় সেদিনের সব পরিকল্পনাই বাতিল হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ সেদিন কিছুই করা গেল না। মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা কিন্তু জানতে পারেননি তাঁদের পার্কে বসা দেখে ভবানী ও রবীন্দ্র হোটেলে ফিরে গিয়েছেন।

সেদিনই সন্ধ্যার পর ভবানী ও রবীন্দ্রর সাথে মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলার দেখা হতে দারুণ ভাবে উত্তেজনা প্রকাশ করেছিলেন মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা এবং ভবানী ও রবীন্দ্রর সাহসিকতা নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। সেদিন অপারেশন ব্যর্থ হওয়ায় মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর ঠিক হল এর পর যেন কোনভাবেই তাদের অপারেশন ব্যর্থ না হয়।

পরের দিন ভোরের দিকে মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা এসে উপস্থিত হলেন স্যানেটরিয়াম হোটেলে। সেখানে তাঁদের মধ্যে আবার আলোচনা হল। পিস্তল ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র পরিষ্কার করা হল। পিস্তলের গুলি আগুনে গরম করে নেওয়া হল।

মনোরঞ্জনের স্বীকারোক্তি থেকে পরে জানা গিয়েছিল আগুনের তাপে উজ্জ্বলাই আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি গরম করে দিয়েছিলেন। মনোরঞ্জনের স্বীকারোক্তিমত হোটেলের ঘর থেকে প্রচুর পরিমাণে পোড়া কাগজের টুকরো পুলিস সিজ করেছিল। মনোরঞ্জনের দেওয়া স্বীকারোক্ত যে সঠিক ছিল এর থেকে খানিকটা বোঝা গিয়েছিল।

পিস্তলের গুলি আগুনের তাপে গরম করে দেওয়ার পর মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা স্যানেটরিয়াম হোটেল থেকে 'স্নো-ভিউ' হোটেলে চলে এসেছিলেন। এরপর পরিকল্পনামাফিক বিকেলের দিকে সবাই চলে এসেছিলেন দার্জিলিঙের লেবং রেসকোর্সে। সেদিন ছিল ৮ মে।

ভবানী ও রবীন্দ্র লেবং রেস কোর্সে এসে দুখানি টিকিট কিনেছিলেন। সেই টিকিটে বিশেষ এনক্লোজারে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বুঝতে পেরে বিশেষ এনক্লোজারে প্রবেশ করার জন্য তাঁরা দু-টাকা দামের আরো দুটি টিকিট কিনেছিলেন বিশেষ এনক্লোজারে প্রবেশ করার জন্য। বিশেষ এনক্লোজারে ঢুকে ভবানী ও রবীন্দ্র গভর্নর জেনারেলের আসনের কাছাকাছি দুটি আসন নিয়ে বসে পড়েছিলেন। এই সময় সেখানে এসে ঢুকেছিলেন উজ্জ্বলা ও মনোরঞ্জন। তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন, গভর্নর এসে তাঁর আসনে বসার পর মনোরঞ্জন ভবানী ও রবীন্দ্রকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্যার অ্যান্ডারসনকে শনাক্ত করে দিয়ে উজ্জ্বলাকে নিয়ে রেস কোর্স ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এরপর বেলা অনুমান ৩টার পর ঘটেছিল সেই সাংঘাতিক ঘটনা।

কলকাতা হাইকোর্ট রায়ের এক জায়গায় বলেছিলেন—ঘটনার সাথে যে ভবানী ভট্টাচার্য যুক্ত ছিলেন সেই ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তাঁকে ঘটনার দিন এবং নির্দিষ্ট সময়ে পিস্তল থেকে গুলি ছুড়তে দেখে পুলিসও তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিল। সেই গুলিতে আহত হয়েছিলেন ভবানী ভট্টাচার্য। ভবানীকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হাসপাতালের বেডে শুয়ে ভবানী পুলিসের কাছে জবানবন্দি দিয়ে স্বীকার করেছিলেন তিনি স্যার অ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গভর্নর জেনারেলকে হত্যা করা।

আপিল আদালতও একই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন বাংলার গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়ায় ভবানী ভট্টাচার্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারার অপরাধে অপরাধী।

রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সম্বন্ধেও একই সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছিল আদালতকে। একাধিক সাক্ষী রবীন্দ্রনাথকে গুলি ছুড়তে দেখেছিলেন স্যার

অ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে। রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জিও আদালতের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারায় রবীন্দ্রনাথকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

মনোরঞ্জন সম্বন্ধে স্পেশাল ট্রাইবুনাল এবং কলকাতার হাইকোর্টের আপিল বেঞ্চ বলেছিলেন—প্রকৃতপক্ষে অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে মনোরঞ্জনই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ছিলেন বিপ্লবী দলটির একজন নেতা।

মনোরঞ্জন ঢাকায় হামেশা যাতায়াত করতেন সুরেশ মজুমদারের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে বাড়ির ছাদে বসে উজ্জ্বলার সাথে গুপ্ত আলোচনা করতেন। তাছাড়া ৩ মে তিনি ওগুলোকে নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। অনেকেই দেখেছিলেন তাদের কলকাতা যেতে। তাছাড়া মনোরঞ্জনের সাথে দার্জিলিং রেল স্টেশনে উজ্জ্বলাকে দেখেছিলেন উজ্জ্বলার এক পরিচিতজন। 'স্নো-ভিউ' হোটেলে একই ঘবে উজ্জ্বলার সাথে থাকতে দেখা গিয়েছিল মনোরঞ্জনকে।

স্যানেটোরিয়াম হোটেলের ওয়েটার সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলাকে সে যাতায়াত করতে দেখেছে তাদের হোটেলে। ঘটনার দিন দুই আগেও মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা 'স্যানেটোরিয়াম' হোটেলে এসে ভবানী ও রবীন্দ্রর সাথে একসাথে বসে চা পান করেছিল। স্যানেটোরিয়াম হোটেলের ওয়েটার সেদিন একসাথে ৪ কাপ চা পরিবেশন করেছিল চারজনকে। হোটেলের বিল মামলায় দাখিল করা হয়েছিল। বিল মিটিয়ে দিয়েছিলেন ভবানী ও রবীন্দ্র।

মনোরঞ্জন ঘটনার দু'দিন বাদে যখন দার্জিলিং থেকে ট্রেনে উজ্জ্বলাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরছিলেন, তাঁদের ট্রেনের মধ্যেই একজন পুলিস ইনসপেক্টর চিনতে পেরেছিলেন। মনোরঞ্জনকে পুলিস ইনস্‌পেক্টর নাম জিজ্ঞাসা করতেই তিনি নিজের আসল নাম গোপন করে অন্য নাম বলেছিলেন। মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে নানারকম সাক্ষ্য এসেছিল অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায়।

পরবর্তীকালে অ্যান্ডারসন ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তরা তাঁদের দেওয়া

স্বীকারোক্তি অস্বীকার বা পরিবর্তন করলেও সাক্ষ্য-সাবুদ থেকে প্রমাণ হয়েছিল স্যার অ্যান্ডারসনকে হত্যা করার জন্যেই মনোরঞ্জন, উজ্জ্বলা, ভবানী এবং রবীন্দ্র দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলেন।

হাইকোর্ট আপিলের রায় লিখতে বসে মনোরঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনায় বলেছিলেন—ট্রাইবুনাল মনোরঞ্জনকে দোষী সাব্যস্ত করে অন্যায় করেনি। অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে মনোরঞ্জন গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। মনোরঞ্জন দার্জিলিংয়ে যাতে তাঁদের উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করে সেইজন্য সব সময় যোগাযোগ রাখতেন ভবানী ও রবীন্দ্রর সাথে। মনোরঞ্জন শুধু হত্যা ষড়যন্ত্রের জন্যই দায়ী ছিলেন না, বে-আইনিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার জন্য অপরাধী হয়ে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

উজ্জ্বলা মজুমদারও আদালতে স্বীকাবোক্তি কবেছিলেন। মামলা চলাকালীন অবস্থায় সেই স্বীকারোক্তির কথা অস্বীকার করেছিলেন। উজ্জ্বলা কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন—তিনি অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিলেন। মনোরঞ্জনেব স্বীকারোক্তি সাথে উজ্জ্বলার স্বীকারোক্তিব ভীষণ মিল ছিল।

হাইকোর্ট আপিলে সবদিক বিচার-বিবেচনা করে একই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তিনি অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে অন্যান্যদের একইভাবে জড়িত ছিলেন। তাছাডা বে-আইনি ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগটিও তাঁর বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায় মেনে নিয়েছিলেন হাইকোর্ট। উজ্জ্বলার পর মধুসূদন ব্যানার্জি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছিলেন হাইকোর্ট। ঘটনার দিন মধুসূদন দার্জিলিংয়ে ছিলেন না। তিনি অন্য কোথাও ছিলেন। মধুসূদন কেন ঘটনার দিন দার্জিলিংয়ে ছিলেন না তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। উজ্জ্বলার ভাই গোপালের সাক্ষ্য থেকে দেখা গিয়েছিল—গোপালকে দিয়ে মধুসূদন তাঁর নিজের গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন। আসল উদ্দেশ্য ছিল মনোরঞ্জনের সাথে উজ্জ্বলাকে দার্জিলিংয়ে পাঠানো এবং গোপালের কাছে দার্জিলিংয়ের ঘটনা গোপন রাখা।

উজ্জ্বলার বাবা সুরেশবাবুকে বলা হয়েছিল—গোপাল ও উজ্জ্বলা

কয়েকদিনের জন্য যাবেন ননীবালার বাড়িতে। উজ্জ্বলাকে দার্জিলিং পাঠাতে হলে গোপালকেও সেখানে পাঠাতে হত। নতুবা ননীবালার বাড়িতে ভাইবোনের একই সঙ্গে যাওয়ার খবরটি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। গোপাল মধুসূদনের বাড়িতে ছিলেন ৩ মে থেকে ১৫ মে পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে দার্জিলিঙের সব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আগেই বলা হয়েছিল লেবং রেস-কোর্সের ঘটনা ঘটেছিল ৮ মে। গোপালকে কলকাতা থেকে সরিয়ে রাখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—সুরেশবাবু যেন কোনভাবেই জানতে না পারেন গোপাল ও উজ্জ্বলা ননীবালার বাড়ি যাননি। সুরেশবাবু ছেলে মেয়ের ননীবালার বাড়িতে না যাওয়ার ঘটনা জানতে পারলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে ওইভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল পরিকল্পনামাফিক। সুরেশবাবু হয়ত জানতে পারলে ছেলে মেয়ের খোঁজখবর শুরু করতে পারেন। সুরেশবাবুর কানে ননীবালার বাড়িতে উজ্জ্বলা ও গোপাল না যাওয়ার খবর পৌঁছলে পুরো পরিকল্পনাটি ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই জন্যেই মধুসূদনকে দিয়ে গোপালকে মধুসূদনের দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গোপালকে দার্জিলিং অপারেশন হওয়ার আগে কেউ দেখতে না পান এই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

লেবং রেস-কোর্সে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ১৫ মে মধুসূদন কলকাতায ফিরে এসে মুসলমান পাড়ার একটি বাড়িতে উঠেছিলেন। মুসলমান পাড়ার এই বাড়িটি থেকেই মধুসূদনকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছিল। তাঁকে গ্রেপ্তার করার সময় মধুসূদনের গলায় পৈতা পর্যন্ত ছিল না। মধুসূদন যে একজন ব্রাহ্মণ সন্তান এই কথা গোপন রাখার জন্য তিনি তাঁর পৈতা খুলে রেখেছিলেন।

ট্রাইবুনাল মধুসূদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তিনি ঘটনার দিন দার্জিলিংঙে উপস্থিত না থাকলেও অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি একই অপরাধে দোষী। কলকাতা হাইকোর্টও ট্রাইবুনালের এই সিদ্ধান্তের সাথে সহমত পোষণ করেছিলেন। আগ্নেয়াস্ত্র রাখার ব্যাপারে সরকার পক্ষ থেকে মধুসূদন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে যে

অভিযোগটি ছিল কলকাতা হাইকোর্ট অবশ্য সেই অপরাধ থেকে মধুসূদনকে রেহাই দিয়েছিলেন।

সুকুমার ঘোষ ছিলেন বিপ্লবী দলের একজন সক্রিয় সদস্য। অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে তিনি নিজেকে সবসময় পর্দার আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা গিয়েছিল সুকুমার নানাভাবে অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রের সাথে লিপ্ত ছিলেন। পরোক্ষভাবে তাঁর সহযোগিতা ছিল দার্জিলিং অপারেশনে। সুকুমারের বন্ধু পৃথ্বীশ সাক্ষ্য দিয়ে সুকমারের ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির থেকেও সুকুমারের নাম পাওয়া গিয়েছিল।

সুকুমার যে অন্যান্যদের সাথে ঢাকায় উজ্জ্বলাদের বাড়ি গিয়ে শলাপরামর্শ করতেন তাও প্রমাণ হয়েছিল। মধুসূদন যখন কলকাতায় মুসলমান পাড়ায় বসবাস করতে শুরু করেছিলেন, সেইসময় প্রায়ই সুকুমার তাঁর সাথে দেখাশোনা করতে আসত।

মনোরঞ্জনের সাথে ১৫ মে কলকাতায উজ্জ্বলা ফিরে আসার পর তাঁরা দুজনেই মুসলমানপাড়ায় সুকুমারের সাথে দেখা করে বলেছিলেন দার্জিলিং অপারেশনে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত না হওয়ায় সুকুমার খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সুকুমার ঘোষ ছিলেন এক বিচক্ষণ যুবক। নিজে পর্দার আড়ালে থেকে অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে মনোরঞ্জন ব্যানার্জিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। আবার মনোরঞ্জনকেও মূল অপারেশন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে অ্যান্ডারসনকে হত্যা করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন ভবানী ভট্টাচার্য এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে।

হাইকোর্ট বলেছিলেন—সুকুমার ঘোষ অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে ভালভাবেই যুক্ত ছিলেন।

স্পেশ্যাল সুশীলকুমার চক্রবর্তীকে দোষী সাব্যস্ত করে ১২ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। সুশীল চক্রবর্তীকে অপারেশনের কয়েকদিন আগেই পাঠানো হয়েছিল দার্জিলিংয়ে সেখানকার জল-আবহাওয়া বুঝে

নেওয়ার জন্য, ঘটনার ২/১ দিন আগে সুশীলকে দার্জিলিং থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত ছিল সুশীল চক্রবর্তীও অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন। সুশীল চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে আপিল দায়ের করা হয়নি বলে আপিল আদালত তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় যাননি।

এরপর কলকাতা হাইকোর্ট দণ্ডিত আসামীদের দণ্ডের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে ট্রাইবুনাল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। হাইকোর্ট আপিল ট্রাইবুনালের আদেশ অর্থাৎ ফাঁসির আদেশ বহাল রেখেছিলেন। মনোরঞ্জন ব্যানার্জিকেও দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। হাইকোর্ট আইনগত দিক বিচার বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ডের জায়গায় মনোরঞ্জনকে দিয়েছিলেন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।

মনোরঞ্জনের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে হাইকোর্ট রায়ের পাতায় লিখেছিলেন :—

"As far as we can see, the maximum sentence that can be passed against Monoranjan with regard to that part of the charge which relates to conspiracy for an attempt to murder is of fourteen years rigorous imprisonment. That is the power given by section 307 of the Indian Penal Code."

এর পরেই আবার বলেছিলেন :—"We think there is ample evidence on which the commissioners could come to the conclusion, as they did, that one of the offences committed by Monoranjan was one under section 3 of the Bengal Criminal Law (Arms and Explosives) Act-, 1932, adding section 19(A) of the Indian Arms Act, 1878, which makes him liable to transportaion for life. The commissioners did not pass this sentence upon him. We think the offence is so serious that a sentence ought to be passed under that section and we pass on him the sentence of transportation for life."

উজ্জ্বলাকে ট্রাইবুনাল দিয়েছিলেন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। কলকাতা হাইকোর্ট আপিলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জায়গায় কমিয়ে করে দিয়েছিলেন ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

সুকুমারের বিরুদ্ধে ট্রাইবুনালের দেওয়া ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বহাল রেখেছিলেন কলকাতা হাইকোর্ট। মধুসূদন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে দেওয়া দণ্ডাদেশও বহাল রাখা হয়েছিল।

কলকাতা হাইকোর্টে আপিলের পরিসমাপ্তি হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ৩ ডিসেম্বর। হাইকোর্ট একটি স্পেশ্যাল বেঞ্চে আপিলের শুনানি হয়েছিল।

হাইকোর্ট স্পেশ্যাল বেঞ্চটি গঠিত হয়েছিল তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি ডার্বিশায়ার, বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জি এবং বিচারপতি কস্টলোকে নিয়ে। আপিলের রায় লিখেছিলেন প্রধান বিচারপতি ডার্বিশায়ার। অন্যান্য বিচারপতিদ্বয় প্রধান বিচারপতির দেওয়া রায়কে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

মামলাটির নথি ভারতবর্ষের বিপ্লবী ইতিহাস লেখার পক্ষে নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষাশেষি শুরু হয়েছিল নাগা বিদ্রোহ। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চলছিল আইন অমান্য আন্দোলন। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষকের সশস্ত্র আন্দোলন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল একাধিক সশস্ত্র বিপ্লবী দল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে বিপ্লবীরা সূর্য সেনের নেতৃত্বে শহর অধিকার করে রেখেছিল। পেশোয়ারে দশদিন পর্যন্ত ইংরেজ প্রশাসনেব অস্তিত্ব ছিল না। শোলাপুরের শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে শোলাপুরে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে দাবি তুলেছিল। দিকে দিকে শুরু হয়েছিল কৃষক বিদ্রোহ। এই সময় আসামের পরাধীন অঞ্চলে নাগারা স্বাধীন নাগারাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত হয়েছিল ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

এই নাগা বিদ্রোহ পরিচালনা করতে এগিয়ে এসেছিলেন এক বিপ্লবী সশস্ত্র নারী।

।। আট ।।

এই নাগা বিদ্রোহিনীর নাম ছিল গুইদালো। অনেকেই তাঁকে বলতেন গাইডিলিউ। কাবুই নাগা বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গুইদালো। মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে তাঁর পরিচয় হওয়ার পর স্বাধীন নাগারাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। যাদুনাঙ সম্পর্কে ছিলে গুইদালোর সম্পর্কিত ভ্রাতা।

১৯৩০ সালে কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন বিস্তার লাভ করছিল সেই সময় গুইদালোর নেতৃত্বেও নাগা পাহাড়ে বিদ্রোহের লেলিহান অগ্নিশিখা দেখা গিয়েছিল। নাগা বিদ্রোহেও ইংরেজ প্রশাসন বিচলিত বোধ করেছিলেন। নাগাদের হাতে বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মচারী নিহত হয়েছিল। যাদুনাঙকে গ্রেপ্তার করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল ১৯৩০ সালে।

যাদুনাঙকে প্রাণদণ্ড দেওয়া সত্ত্বেও নাগা বিদ্রোহ থামানো গেল না। যদুনাঙের শূন্য স্থান কারোকে দিয়ে পূরণ করা যাবে না—ইংরেজ প্রশাসন এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু শূন্য থাকল না নাগা যদুনাঙের স্থান। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন ঊনিশ বছরের যুবতী গুইদালো। নাগা বিদ্রোহ পূর্ণ উদ্যমে চলল গুইদালোর নেতৃত্বে। নাগা বিদ্রোহিনী এই যুবতী নিজস্ব সব ত্যাগ করে বিদ্রোহের ময়দানে নেমে এসেছিলেন। নাগাজাতি গুইদালোর অসম সাহস দেখে তাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ঢেলে দিয়েছিলেন গুইদোলার নেতৃত্বর প্রতি। গুইদালো ছিলেন নাগাদের কাছে রানী। গুইদালো নাগাদের এই বিশ্বাসকে কখনো অবমাননা করেননি। জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন নাগা বিদ্রোহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্রত গ্রহণ করে। গুইদালোর আদেশে নাগা বিদ্রোহীরা যে কোন সময় মৃত্যুবরণ করতে সম্মত ছিলেন।

রানী গুইদালোর নেতৃত্বে মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলে, কাছাড়ের উত্তরভাগে ও আরো বেশ কিছু অঞ্চলে বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করেছিল।

ইংরেজ প্রশাসকরা গৃহকর আদায় করতে ব্যর্থ হলেন। পেলেন না বেগার ও মজুর হিসেবে কাজ করার জন্য একটি লোককেও।

নাগাদের ভয়ে ইংরেজ প্রশাসনের কর্মচারীরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ নাগা বিদ্রোহী রানী গুইদালোর নেতৃত্বে নাগা রাজ্যের স্বাধীনতার জন্য গেরিলা ধরনের যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। নাগারা পাহাড়ের নানা গুপ্তস্থান থেকে হঠাৎ হঠাৎ ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিসের উপর আক্রমণ করে যাচ্ছিল। নাগাদের এই গেরিলা ধরনের আক্রমণে ব্রিটিশ প্রশাসন নাজেহাল হয়ে উঠেছিল।

এই গেরিলা ধরনের যুদ্ধ চলেছিল ১৯৩১ সাল পর্যন্ত। ব্রিটিশ প্রশাসন ভালভাবেই বুঝেছিলেন—যতদিন রানী গুইদালো নাগা বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেবেন, ততদিন নাগাদের স্তিমিত করা সম্ভব হবে না। সুতরাং গুইদালোকে যে ভাবেই হোক বন্দি করে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে হবে নাগা বিদ্রোহীদের কাছে। তাহলেই নাগা বিদ্রোহীরা গুইদালোকে নেত্রী হিসেবে স্বীকার করবেন না। নাগাদের বিশ্বাস নষ্ট করার জন্য গুইদালোর বিরুদ্ধে নানাধরনের কেচ্ছা প্রচার শুরু হল।

এইসময় মণিপুর রাজ্যের রেসিডেন্ট কমিশনার ছিলেন সম্ভবত ম্যাকডোনাল্ড সাহবে। তিনি বহু চেষ্টা করেও গুইদালোকে বন্দি করতে পারলেন না। প্রশাসনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল রানী গুইদালোকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু পুরস্কার ঘোষণা করা সত্ত্বেও কোন নাগাই তাদের প্রিয় নেত্রী গুইদালোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য এগিয়ে এল না। ইংরেজ প্রশাসন বিফল মনোরথ হয়ে এবার পুরস্কারের অঙ্ক আরো বাড়িয়ে দিলেন। শুধু পুরস্কার ঘোষণা করেই প্রশাসন চুপ করে থাকল না। বলা হল যেই গ্রামবাসী গুইদোলাকে ধরিয়ে দিতে পারবে সেই গ্রামবাসীর গ্রামাঞ্চলে লোকদের দশ বছর পর্যন্ত কোন গৃহকর দিতে হবে না।

ম্যাকডোনাল্ড এত পুরস্কার ঘোষণা করেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে মণিপুর রাজদরবার মারফত ঘোষণা করে দিলেন—গুইদালো হল একজন যাদুকারী এবং ডাইনী।

নাগাদের কাছে 'ডাইনী' বলে কোন মহিলাকে ঘোষণা করলে দারুণ ব্যাপার। নাগাবা 'ডাইনীকে' সহ্য করতে পারত না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'ডাইনী' বলে আখ্যায়িত মহিলাকে নানারকম নির্যাতনের মধ্যে তাকে হত্যা করত। ম্যাকডোনাল্ডও ভেবেছিলেন এইবার নাগারাই রানী গুইদালোকে 'ডাইনী' বলে শেষ করে দেবে। নাগা বিদ্রোহও থেমে যাবে। এই ধরনের প্রচারে নাগারা রানী গুইদালোকে 'ডাইনী' বলে বিশ্বাস করল না। তারা বুঝতে পারল এইটি ইংরেজদের একটি চাল। বিদ্রোহ দমন করার কাযদা। ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল।

ম্যাকডোনাল্ড সাহেব—জোয়ান অফ আর্ক-কে ফরাসি দেশে যেইভাবে 'ডাইনী' বলে প্রচার করে ইংবেজদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল ১৪৩১ সালে সেই কায়দাটি নিতে চেয়েছিলেন গুইদালোর ক্ষেত্রে। কিন্তু সেই কায়দা কার্যকরী হল না।

ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের যখন সব পরিকল্পনা এক এক করে ব্যর্থ হল তখন প্রচুব সৈন্য নামিযে দিলেন নাগাদেব উপর অত্যাচার করার জন্য। বহু নাগাকে হত্যা করা হয়েছিল। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিযে দেওযা হয়েছিল।

এই অবস্থায় রানী গুইদালো বিদ্রোহী নাগাদের নিয়ে ইংরেজ সৈন্যেব উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। হত্যা করেছিলেন বহু সৈন্যকে, দু-পক্ষরই সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছিল দীর্ঘদিন।

কিন্তু শেষপর্যন্ত যে ভাবেই হোক রানী গুইদালোকে বন্দি করা হয়েছিল ১৯৩২ সালেব ১৭ অক্টোবর।

এই বিদ্রোহিনী নারীর বিচারে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। গুইদালোর শাস্তি হওয়ায় নাগা বিদ্রোহ প্রায় থেমেই গিয়েছিল।

স্বাধীনতার জন্য অন্যান্য বিদ্রোহ আলোচনা করলে দেখা যাবে বহু সশস্ত্র আন্দোলনে একাধিক নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অহিংস আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের সংখ্যা অনেক বেশি।

সশস্ত্র আন্দোলনে বিপ্লবী নারীদের অবদানের বিষয় আলোচনা করতে বসে অহিংস আন্দোলনে নারীদের অবদানের কথা বাদ রাখতে হল।

।। নয় ।।

চিটাগাং পাহাড়তলিতে এ, বি রেলওয়ে ইউরোপিয়ান ক্লাবে ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর যখন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আক্রমণ করার পর পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার এড়াতে যে সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন তা কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সশস্ত্র নারী বিপ্লবী। ধারণাটা ঠিক নয়। প্রীতিলতার অনেক আগেই সশস্ত্র আন্দোলনে একাধিক নারী এগিয়ে এসেছিলেন।

"India wrests freedom" বইটির এক জায়গায় লেখা হয়েছিল—"It is the advent of women in the movement for the violent disruption of the Britsh Empire in India. The first woman to take part in the freedom struggle—Sister Nivedita and Annie Beasant—were of Irish origin, but they were Indians by adoption. Nivedita came in close touch with revoulutionaries, but she was not one of them. The same thing might be said of Annie Beasant who had been detained by the British Indian authorities for her part in the Home Rule movement, in which she was associated with Balgangadhar Tilak. And when the Extremist recaptured the congress ten years after the Surat split 1907, she became the President of the Calcutta session in 1917. But both these noble and heroic women were too 'religious' to be called revolutionaries in the sense in which the terms is used here.

ঢাকায় ১৯২৫ সালে হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল 'দীপালী সংঘ', বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স দলে হেমচন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টায় একাধিক নারী যোগদান করেছিলেন। এই সব নারীরা সশস্ত্র আন্দোলনে শামিল হতে দীপালী সংঘের সভ্যপদ নিয়েছিলেন। এই দীপালী সংঘ থেকেই তৈরি হয়েছিল শ্রী সংঘ বিপ্লবী সংস্থা হিসেবে। এই সশস্ত্র বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন লীলা নাগ। লীলা নাগের নেতৃত্বে এবং হেমচন্দ্র ঘোষের সহযোগিতায় স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সশস্ত্র নারী বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল শ্রীসংঘের শাখা হিসেবে।

সেইদিক থেকে দেখতে গেলে সশস্ত্র নারী হিসেবে লীলা নাগকে প্রথম সশস্ত্র নারী বিপ্লবী হিসেবে বলা যেতে পারে। এইজন্যই বোধহয় বলা হয়েছিল—''So the credit for pioneering women's association with revolutionary work must go to Lila Nag.''

এর পরেই সশস্ত্র বিপ্লবী হিসেবে এসেছিলেন লীলা রায়। কলকাতায় তৈরি হয়েছিল ছাত্রী সংঘ। এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীরাও পিছিয়ে ছিলেন না।

প্রীতিলতা সম্বন্ধে অনেকেরই একটা অলীক ধারণা রয়েছে তিনি নাকি চট্টগ্রামের আরমারি রেইডে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বোধহয় ধারণাটা সঠিক নয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে কোন মহিলা বিপ্লবী অংশগ্রহণ করেননি। প্রীতিলতা ছিলেন পাহাড়তলি অপারেশনে অংশগ্রহণকারী মহিলা বিপ্লবী।

তাই বোধহয় নথিপত্র দেখে বলা হয়েছিল—"Priti met the great Surya Sen long after the event and was thus a gift to the Cittagang organizition from Dipali Sangha of Dacca and Chattri Sangha of Calcutta."

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষাশেষি থেকে তৃতীয় দশকের মধ্যে একাধিক নারী বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দল যখন নারী শাখাকে আলাদাভাবে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন—তখন নারী শাখার মূল কেন্দ্রকে আনা হয়েছিল কলকাতায়। এই মূল কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন মীরা দত্তগুপ্ত। মীরা দত্তগুপ্ত ছিলেন বহুদিন ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে জড়িত। 'বেণু' নামে একটি জার্নালের সাথেও তিনি সংযুক্ত ছিলেন। সশস্ত্র নারী বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদারের কথা বলা হলেও শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্তের কথা বলা হয়নি। কমলা দাশগুপ্ত যোগ দিয়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী দলে এবং দলের নির্দেশমত কাজ করে গিয়েছিলেন।

এই সব সশস্ত্র বিপ্লবী নারীদের পিছনে সাহায্যকারী হিসেবে ছিলেন একাধিক নারী কিন্তু সামাজিক বাধা-বিপত্তিতে তাঁরা নিজেদের নাম গুপ্ত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সব নারীরা নাম প্রকাশ না করেও দলের

ভাণ্ডারে বহু টাকা নানাভাবে যোগান দিয়েছিলেন দল পরিচালিত করতে। দলের কাছে ছিল অর্থের প্রয়োজন।

এই ব্যাপারে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে—Women are notoriously fond of ornaments and who amongst us has not taught over gray's give :

What female heart can gold despise? What Cat's adverse to fish?

কিন্তু ভারতবর্ষের একাধিক মহিলা স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করে দেশের প্রয়োজনে নিজেদের বহু গয়নাগাটি দান করেছিলেন বিপ্লবী দলকে।

চট্টগ্রাম বিপাব্লিকান পার্টির অনন্ত সিং মহিলাদের সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত করতে চাননি। প্রথমদিকে সূর্য সেনও নারীদের দলে নেননি। কিন্তু জালালাবাদের ঘটনার পরে তিনি দলে নিয়েছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত ও আরো অনেক নারীকে। তিনি বুঝেছিলেন নারীদেরও প্রয়োজন আছে দেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে। তাঁরাও পারেন বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

প্রফুল্লনলিনী ব্রাহ্মর কথা কি ভোলা যায়। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একাধিক স্কুল-কলেজের মেয়েদের দলে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের বিপ্লবী কর্মধারায় শিক্ষা দিয়েছিলেন।

প্রফুল্লনলিনী সম্বন্ধে বলা হয়েছিল—"She recruited some girls of the local school and inspired them with her courage and revolutionary idealism."

সুনীতি চৌধুরীকে ও শান্তি ঘোষকে বোধহয় বলা যায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বপ্রথম দুই সশস্ত্র বিপ্লবী নারী। এই দুই অগ্নিকন্যার উপর দলের গভীর বিশ্বাস ছিল। এই দুই অসম সাহসী নারীকে নিয়ে গিয়ে ময়নামতী পাহাড়ে রিভলভার চালানোর শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এই দুই বিপ্লবী নারী খুব ভালভাবে আগ্নেয়াস্ত্র চালানো শিখে নিয়েছিলেন ময়নামতী পাহাড়ে।

১৯৩১ সাল। ১৪ ডিসেম্বর, সুনীতি ও শান্তি যখন তাঁদের ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় সতীশ রায় যিনি ছিলেন বিপ্লবী নন্দী ও প্রফুল্লনলিনীর খুব কাছের লোক তাকে পাঠানো হয়েছিল সুনীতি ও শান্তিকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ কোন দায়িত্ব পালনের জন্য। সতীশ রায় সুনীতি ও শান্তিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর গেটে নিয়ে এসেছিলেন একটি ঢাকা দেওয়া গরুর গাড়িতে। সময়টা শীতকাল। সুনীতি ও শান্তির গায়ে ছিল চাদর। তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল রিভলভার। তারা আগ্নেয়াস্ত্র তাদের ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় ঢুকে তারা স্লিপ দিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেব সাথে দেখা করার প্রার্থনা জানালেন। সেই সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহকুমা শাসকের সাথে তাঁর অফিস ঘরে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুনীতি ও শান্তিকে তাদের অফিস ঘরে না ডেকে দু'জনেই অফিস ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলেন মহিলা দু'জনের সাথে দেখা করতে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও মহকুমা শাসক তাদের অফিসঘর থেকে সুনীতি ও শান্তির সাথে বারান্দায় দেখা করতে আসার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। উপায়ান্তর না পেয়ে তখন সুনীতি ও শান্তি তাদের স্কুলের মেয়েদের খেলাধুলা নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলে একটি চিঠি তুলে দিয়েছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে। কুমিল্লার তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মিঃ G.T.S. Stevens কে হত্যা করা সম্ভব না হওয়া মানসিকভাবে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন সুনীতি এবং শান্তি। কারণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের বলেছিলেন—স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের সাথে তিনি কথা বলবেন। সুনীতি ও শান্তি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতিগতি দেখে বিব্রতবোধ করছিলেন। হেড মিস্ট্রেস ব্যাপারটা জানতে পারলে তাঁদের উপর নানা সন্দেহ হবে এবং তাঁরা যে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত তাও জানাজানি হয়ে যেতে পারে। আসলে তো সুনীতি ও শান্তির দেওয়া আবেদন পত্রটির বয়ান মূল্যহীন ছিল।

যখন সুনীতি ও শান্তি এই নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন—কোন কারণে আবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও এস. ডি. ও বাইরে বারান্দায় এসেছিলেন।

সুনীতি ও শান্তি এই সুযোগ অপব্যবহার করলেন না। ব্লাউজের ভিতর থেকে রিভলভার বার করে এক মুহূর্তের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিলেন। মৃত্যু ঘটল প্রতাপশালী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নারী সশস্ত্র বিপ্লবীর হাতে।

গ্রেপ্তার হলেন সুনীতি ও শান্তি। হত্যার অভিযোগে তাঁদের বিচার হয়েছিল। বিচারেব দু'জনের বিরুদ্ধেই যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এতবড়ো ঘটনার পরও সুনীতি ও শান্তির মত অল্প বয়সের মেয়ে দু'টির মুখ থেকে ব্রিটিশ পুলিস একটি কথাও বার করতে পারেনি। দলের সম্বন্ধেও তাদের কাছ থেকে কিছুই জানতে পারেনি সরকারি প্রশাসন। প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মকে সুনীতি ও শান্তির সাথে যোগাযোগ রাখতে দেখা গিয়েছিল। সন্দেহবশত প্রফুল্লনলিনীকে ঘটনার পরের দিনই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বোধহয় ১৯৩২ সালের ২২ মার্চ কোন সাক্ষ্যসাবুদ না পাওয়ায় প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এরপরে অন্য আছিলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল।

জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম আই-এ ও বি-এ পাশ করেছিলেন। প্রফুল্লনলিনী মুক্তি পাওয়ার পর যখন কুমিল্লায় ফিরে এসেছিলেন সেই সময় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন ১৯৩৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি। ভালভাবে চিকিৎসার অভাবে প্রফুল্লনলিনী মারা যান। আজ এঁদের জন্য ভাবতেও দুঃখ হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী একাধিক নারীর কথা আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারলাম। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সুনীতি চৌধুরী, শান্তি ঘোষ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, পারুল মুখার্জি, উজ্জ্বলা মজুমদার, প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম, কমলা দাশগুপ্ত প্রভৃতিরা। পরোক্ষভাবে সশস্ত্র আন্দোলনকে সমর্থন ও সাহায্য করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, অ্যানি বেসান্ত ও যুবতী বয়সে প্রভাবতী দেবী চৌধুরাণী। পরে অবশ্য তিনি অহিংস আন্দোলনে গান্ধীজীর সাথে সাক্রিয়ভাবে ছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে এতকাল আগেও যে বাংলার একাধিক শিক্ষিত নারী সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত থেকে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ধরেছিল ইংরেজ আমলাদের খতম করার জন্য এই জন্য বঙ্গবাসী নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারেন।

বহুদিন আগে আন্দামানে একটি দ্বীপে গিয়ে সেখানে দেখেছিলাম একটি ফাঁসিঘর। সেলুলার জেল নয়। ওখানকার লোকজনদের কাছে শুনেছিলাম এই ফাঁসিঘরে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মহিলাদের ফাঁসি দেওয়া হত। চেষ্টা করেছিলাম ফাঁসিঘরটির ইতিহাস সংগ্রহ করতে। কিন্তু পারিনি। তবে মহিলাদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য যখন ফাঁসিঘর তৈরি করা হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই একাধিক মহিলাকে ফাঁসি দেওয়া হয়ে থাকবে সেখানে তা অনুমান করতে দোষ কোথায়।

পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার ব্রত গ্রহণ করার জন্য এতগুলি বাঙালি নারী বিপ্লবী হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ তুলে নিয়েছিলেন নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে অথচ তাদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরি হল না ভাবতেও কষ্ট হয়।

এই কথা বোধহয় অনেকেরই জানা আছে স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাটি। বহু সশস্ত্র বিপ্লবীকে জন্ম দিয়েছিল মেদিনীপুর জেলা। এই জেলার একাধিক যুবক দেশের মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে জীবন দিয়েছিলেন। দীনেশ নামে একটি মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র ছিলেন নামকরা আইনজীবী জ্যোতিষ গুপ্তের ছোটভাই। সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র দীনেশ সশস্ত্র বিপ্লবী দল গঠন করে তুলেছিলেন মেদিনীপুরের একাধিক যুবকে নিয়ে। দীনেশের ভাল লাগত বহু ধরনের বই পড়তে। লেখা পড়ায় ভাল ছাত্র হিসেবে দীনেশের নামডাক ছিল।

বোধহয় সালটি ছিল ১৯২৮! হঠাৎ দীনেশ জানতে পেরেছিলেন মেদিনীপুর শহরের ওয়াই এম সি হলে স্থানীয় ক্রীশ্চানদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেই সভায় দীনেশের আইনজীবী দাদা জ্যোতিষ গুপ্ত আমন্ত্রিত হয়েছেন। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "The place of religion in Man's life." দীনেশ আমন্ত্রণহীন হয়েও সভাটিতে নিজের থেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন। সভার বক্তাদের বক্তব্য থেকে দীনেশ বুঝতে পারলেন—বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য হিন্দু জাতিকে অবমাননা করা এবং

ভারতবর্ষের পুরানো সংস্কৃতিকে সমালোচনা করা। উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দীনেশ নিজেকে সামলাতে না পেরে সেই সভাতেই ফুঁসে উঠলেন। তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন বক্তাদের বক্তব্য। দীনেশের বক্তব্য সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিলেন একাধিক যুবক। তাঁরা দীনেশের মধ্যে আবিষ্কার করলেন বিপ্লবী চেতনা।

ইংরেজিতে বলা হয়েছিল—"At he end of neeting or what re-minded of the meeting, Dinesh found himself at the centre of a group of youngmen who discovered in him the hero they were looking for—intrepid, eloquent and chairismatic."

আস্তে আস্তে দীনেশের সক্রিয় প্রচেষ্টায় স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা, একাধিক ক্লাবে সদস্যরা তাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী দল গড়ে তুলল। ডিসেম্বর মাসে মেদিনীপুরে দীনেশ যুব সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বোসকে। সুভাষচন্দ্র বোস সভায় এসেছিলেন এবং ভালভাবেই বুঝে গিয়েছিলেন যুবকদের উদ্দেশ্য। এরপর দীনেশের নেতৃত্বে বিপ্লবী দল গঠিত হয়েছিল কাঁথি এবং খড়্গপুরে। মেদিনীপুর জেলাকে সশস্ত্র বিপ্লবের পীঠস্থান বলা হয়—এই কারণে এই জেলা জন্ম দিয়েছিল বিমল দাশগুপ্ত, জ্যোতিজীবন ঘোষ, নির্মলজীবন ঘোষ, প্রদ্যুত ভট্টাচার্য, প্রভাংশু পাল, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু, অমর চ্যাটার্জি, সুধীর পট্টনায়ক, নরেন দাস, ফণী দাস, অনাথ পাঁজা, নির্মল রায়, কামাখ্যা ঘোষ, ভূপতি সেন, মৃগেন দত্ত, ভূপতি মণ্ডল, বিনোদ সেন, সনাতন রায়, অমর সেন, চন্দ্রশেখর সেন, শান্তি গোপাল সেন এবং অনেক সশস্ত্র বিপ্লবীকে।

ক্ষুদিরামের কথা আর নতুন করে না বলাই ভাল। আমাদের বক্তব্য ছিল নারীদের সশস্ত্র বিপ্লবে কি ধরনের ভূমিকা ছিল।

বিপ্লবী জ্যোতিজীবন ও নির্মলজীবন ঘোষের মা প্রভাসরনজিনি দেবী নানাভাবে বিপ্লবী যুবকদের সাহায্য ও মনোবল জুগিয়েছিলেন। একজন বয়স্কা নারী পক্ষে সেই যুগে এই ধরনের মনোভাব আশা করা যায় না। প্রভাসরনজিনি দেবী ছাড়াও শান্তি সেন, কুসুমরেণু দেবী, রমা সেন, চারুশীলা

দেবী ও আরো একাধিক নারী বিপ্লবী যুবকদের পরোক্ষভাবে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন।

"India wrests Freedom" বইটিতে লেখা হয়েছিল— "Incomplete as the present narrative is, it would be even more so if do not remember here the women, many of them elderly, who helped these youths with money, often arranged shelters and, more importantly, inspired them with confidence. First to be mentioned is Probhasranjini Debi, mother Jyotigiban and Nirmaljiban, who reminds me of the Roman mother who said to her soldier-son that he must return from the battlefield 'with the shield or upon it'. Then there was the old aunt of Kshiti Prasanna Sen, wife of Ambikaprasanna Sen, the leading advocate of Midnapore, who was later extended from the place because his large house was attegedly den of "terorists". Dinesh had an elderly sister—Santi Sen—who with their sister in law, Lawyer Jyotish Gupta's wife, Kusumrenu, would speed Dinesh and his comrades on their perilous Journey as did some other ladies, among them Amai Sen's mother and Rama Sen, Uma Sen and Charusila Debi.

It would be fair to claim that if the Midnapore revolutionaries acted as a compact body that seldom made a wrong move, it was in no small measure due to the silent-secret support of these and other women."

অনেক সশস্ত্র নারী বিপ্লবীকে নিয়ে আলোচনা করলেও মহিয়সী নারী বীণা দাসের কথা বলা হয়নি। বিনয় বোস যেমন লোম্যানকে হত্যা করেছিলেন তেমনি বীণা দাস স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে বীণাদের পরিবারের বিশেষ যোগাযোগ ছিল।

নানাসূত্র থেকে বোঝা যায় সুভাষচন্দ্র জানতেন বীণা দাস সশস্ত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত। কিন্তু সুভাষ বীণাকে তাঁর নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে আসতে বলেননি।

বাঙালি নারীর অবদান স্বাধীনতা আন্দোলনে বোধহয় ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না।

।। দশ ।।

আবার ফিরে আসা যাক চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালিতে। সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদা ১৯৩০ সালে ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। মাস্টারদা দলের সদস্যদের সব সময় বুঝিয়ে নিতেন—বিপ্লবী কখনই কোন অবস্থায় স্বীকারোক্তি, নিজে থেকে ধরা দেবেন না বা আত্মহত্যা করবেন না। সেই সময় কিন্তু মাস্টারদা সত্যাগ্রহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কিন্তু সত্যাগ্রহের ডাকে সাড়া দেওয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রামে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলে ইস্টার বিপ্লব শুরু হয়। এই বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটেছিল ১৯৪১ সালের ২৪ আগস্ট। এই সংগ্রামেরও প্রথম পরিচালক ছিলেন মাস্টারদা। মাস্টারদার গ্রেপ্তারের পর বিপ্লবী দলটির নেতৃত্ব দেন তারকেশ্বর দস্তিদার। মাস্টারদা এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি। যদিও এই দুই বিপ্লবীর ফাঁসির কথা আগেই বলা হয়েছে। এরপর ন্যাশনাল আর্মির কর্ণধারের ভূমিকা পালন করেছিলেন মহান সশস্ত্র বিপ্লবী শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত।

মাস্টারদা বিশ্বাস করতেন সততার সাথে অবিচলভাবে আদর্শের প্রতি বিশ্বাস থাকলে সারা ভারতকে পথ দেখাবে ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি, চিটাগাং।

১৯৩১ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুনোকে হত্যা করল সশস্ত্র বিপ্লবীরা। এই হত্যাকাণ্ডে ব্রিটিশ প্রশাসন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

এর পরের ঘটনা ধলঘাট যুদ্ধ। এই সময় সশস্ত্র বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল সাবিত্রী দেবীর বাড়ি। ১৯৩২ সালের ১৩ জুন সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে ছিলেন মহান বিপ্লবী সূর্য সেন, নির্মল সেন, বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ও অপূর্ব সেন, রাতেই নিহত হলেন নির্মল সেন। তারা আগে নির্মল সেনের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন। মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল বিপ্লবী অপূর্ব সেনকে। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা নানা কায়দায় সেই আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

সশস্ত্র বিপ্লব ভারতবর্ষে পরাধীনতাকে কতখানি নাড়া দিয়েছিল— তখনকার পুলিস রিপোর্ট দেখলেই বোঝা যাবে। পুলিস রিপোর্টে লেখা হয়েছিল : —"The Romantic appeal of the raid altracted into the fold of the terrorist party women and young girls who from this time onwards are found assisting the trrorists as house keepers messengers, custodians of arms and sometimes as commrades."

সশস্ত্র আন্দোলনে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ভূমিকার কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। প্রীতিলতার আত্মত্যাগে বহু নারীর মধ্যে বিপ্লবের উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল। এই সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল "Females are determined that they will no more leg behind but they will stand side by side with their brothers in any activities, however dangerous or difficult.

পরিকল্পনামাফিক পাহাড়তলি আক্রমণ করে সবাই গৌরবের সাথে ফিরে এলেন। শুধু ফিরলেন না একজন। তিনি সেইদিনের অপারেশনের অধিনায়িকা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

না ফিরলেও তিনি ব্রিটিশ পুলিসের হাতে ধরা দেননি। পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর মৃতদেহটি শুধু পেয়েছিল ইংরেজ প্রশাসনের পুলিস। এই সর্বত্যাগী বীরয়সি মহিলাকে কি স্বাধীনতা আন্দোলনে ভোলা যায়?

বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনের জন্য গৈরালা থেকে গ্রেপ্তার হন দলের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন ১৯৩৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির গুপ্ত বৈঠকে নেত্র সেনের বিচার হয়েছিল। বিচারে নেত্র সেনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকের রেহাই ছিল না বিপ্লবীর কাছে। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এইরকম ভাবে চরম দণ্ড পেতে হয়েছিল নন্দলাল, নরেন গোঁসাই, কৃপাল সিং ও ফণী ঘোষকে।

সশস্ত্র বিপ্লবী নারী কল্পনা দত্ত কি পিছিয়ে ছিলেন?

গহিরার পূর্ণ তালুকদারের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রাতের অন্ধকারে কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার। মনোরঞ্জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন পুলিসের সাথে যুদ্ধ করে, সেই রাতে আশ্রয়দাতা পূর্ণ তালুকদারের পুলিসের গুলিতে মৃত্যু ঘটল।

মহানায়ক সূর্য সেনের বিচার হয়েছিল চট্টগ্রাম জেলের অভ্যন্তরে। এর আগেই বলা হয়েছে সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়েছিল, দিনটি ছিল ১৯৩৪ সালের ৭ জানুয়ারি, হাসতে হাসতে এই দু'জনে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন, দেশমাতৃকার মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত এই সব সশস্ত্র বিপ্লবীদের যেন জানাই ছিল জীবনের শেষ পরিণতি।

বিপ্লবী সূর্য সেন মৃত্যুর আগে প্রশংসা করেছিলেন সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের ভূমিকার। ফাঁসির রায় শুনে সূর্য সেন তাঁর শেষ আবেদনে দলের সদস্যদের উদ্দেশে বলেছিলেন—ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির ভূমিকার জন্য তিনি গর্বিত। তিনি বলেছিলেন :—"Ideal and unity is my farewell message. Rope is hanging over my head. Death is knocking at my door. My mind is soaring towards eternity. There is time for 'Sadhana'. This is the time for prepration to embrace death as a friend and this is the time to recall lights of other days as well.

Sweet remembrance of you all. My dear brothers and sisters, break and monitory of my life and cheer me up. At such a pleasant, all such a solemn moment, what shall I leave behind for you? Only one thing, that is my dream, a golden dream—a dream of free India. How suspicious a moment it was, when I first saw it . Throughout my life most passionately and untiringly, I have persued it like a lunatic. I know not where I am compelled to stop my pursuit to-day. If icy hands

of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your followers as I do to-day. onward. my comrades, onward—never fall back. The day of bondage is disappearing and the dawn of freedom is ushered in. Be up and doing. Never the disappointed. Success sure. God bless you!

Never forget the 18th April, 1930, the day of Easter Rebellion in Chittagang. Keep ever fresh in your memory the fights of Jalalabad, Julda, Chandannagar and Dhalghat. Write in red letters in the core of your hearts the names of all patriots who have sacrificed their lives at the altar of India's freedom.

My earnest appeal to you –there should be no division in your organisation. My blessings to you all, inside and outside the Jail. Fare you well.

Logn live revolution.

Bande Matram.

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বোধ হয় কোনওদিন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির কথা ভোলা যাবে না। ভোলা যাবে না প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্তকে।

বিপ্লবী বীরেন চক্রবর্তীর বাড়িতে একসময় বিনোদ দত্তকে এনে রাখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন খুব অসুস্থ। পুলিস গুপ্ত খবর পেয়ে বীরেনবাবুর বাড়িতে একাধিকবার তল্লাশি চালিয়েছে। কিন্তু বিনোদ দত্তকে সরিয়ে নেওয়ায় তাঁকে পাওয়া যায়নি। বীরেনবাবুর দিদি এবং বৌদি ছিলেন বিপ্লবীদের সমর্থক। তাঁরা বিনোদবাবুকে বহু ঝুঁকি নিয়ে সেবা শুশ্রূষা করেছেন। তীব্র তিরস্কার করেছেন বৃটিশ প্রশাসনের পুলিশকে। প্রতিদানে পেয়েছেন কারাগারের নির্মম যন্ত্রণা। এই সব দিদি-বৌদির

অবদানের কথা না জানলে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভাল ভাবে জানা যাবে না। ভোলা যাবে বা বিপ্লবী সুরেশ বণিকের মায়ের কথা। সুরেশ বণিকের মা সশস্ত্র বিপ্লবীদের মাতৃস্নেহে আদর যত্ন করেছেন। সুরেশ বণিকের বাড়ি ছিল সীতাকুণ্ড থানার বড়ইতলা গ্রামে। এমন কি সুরেশ বণিকের বোনও প্রয়োজনে বিপ্লবীদের বাড়িতে জায়গা দিয়েছেন। তাদের পুলিসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

বীরেন চক্রবর্তীর দিদি চন্দ্রবাণী দেবী এবং বৌদি রাজলক্ষ্মী দেবীর অবদান বোধহয় বিনোদ দত্তর মতো মহান বিপ্লবী কোনওদিন ভুলতে পারেননি। আশ্রয়দানের ব্যাপারে বিপ্লবীদের মায়েদের ভূমিকা ছিল মমতাময়ী ও স্নেহশীল।

১৯৩৩ সালের ১৮ মে চট্টগ্রামের দক্ষিণে গহিরা গ্রামে পূর্ণচন্দ্র তালুকদারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত এবং সুধীন দাস। পুলিস খবর পেয়ে তালুকদার বাড়ি আক্রমণ করে। গ্রেপ্তারিত হন তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্ত। কিন্তু নিহত হন পূর্ণচন্দ্র তালুকদার ও তাঁর ভ্রাতা প্রসন্ন তালুকদার।

১৯৩৪ সালের ৯ জানুয়ারি। বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন রাতে খেতে বসেছেন। এই সময় হঠাৎ বিপ্লবী কিরণ সেন ও খোকা নন্দীর অস্ত্রের আঘাতে নেত্র সেনের খণ্ডিত মস্তক খাবার থালায় পড়ে রক্তস্নাত হল। মহানায়ক সূর্য সেনকে ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার এইভাবে পেতে হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে।

স্বাধীন ভারতের অনেকেই জানেন না বিনোদ দত্তকে আশ্রয় দেওয়া বীরেন চক্রবর্তীর দিদি চন্দ্রবাসী দেবী এবং বৌদি রাজলক্ষ্মী দেবীকে দু'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। এই বর্ষীয়সী নারী দু'জন ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিবেদিত, ক'জনে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে চন্দ্রবাসী বা রাজলক্ষ্মী দেবীর নাম জানেন? স্বাধীনতার ইতিহাসে এদের নাম কি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? স্বাধীনতার পর এই সব বিপ্লবী নারীদের অনুসন্ধান পর্যন্ত করা হয়নি। এঁরা আলোর রেখার বাইরেই চিরকাল রয়ে গেলেন। নাই

বা কেউ মনে রাখল এইসব মহিয়সী নারীর নাম। কিন্তু এইটি তো বাস্তব সত্য "নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

মহিলারাও বিপ্লবী আন্দোলনে পিছিয়ে ছিলেন না। তারাও অনেকেই বিপ্লবী দলের কাজ করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য।

দক্ষিণ-মন্দিরা গ্রামের অম্বিকা মজুমদারের স্ত্রী কনকলতা মজুমদারের কথা কারও মনে নেই। বিনোদ দত্তকে নানা কৌশলে খাবার নিয়ে আসতেন বৌদি কনকলতা। কেউ জানতে পর্যন্ত পারেনি বিনোদ দত্তকে খাবার দিয়ে দিনের পর দিন কি ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন কনকলতা মজুমদার।

প্রীতিলতাকে অনেক ভারতবাসী জানেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ কাহিনী কিন্তু এখনও জানেন না। পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে প্রীতিলতা স্বেচ্ছায় পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মাহুতি দেওয়ার ঘটনা বহুল প্রচারিত। কিন্তু অনেকেই জানেন না—প্রীতিলতার মৃত্যুর পর তার বক্ষঃসংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণের একটি ছবি পাওয়া গিয়েছিল। ধলঘাট যুদ্ধের পর প্রীতিলতার লিখিত একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়েছিল সূর্য সেনের কাছ থেকে তাঁর গ্রেপ্তারের সময়।

নির্মল সেনের সাথে যখন প্রথমদিন দেখা হয় প্রীতিলতা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন নির্মল সেনের আচরণে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম নারী শহিদের মর্যাদা পেয়েছিলেন মাস্টারদার প্রিয় শিষ্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার—যাকে মাস্টারদা 'রানী' বলে ডাকবেন।

মাস্টারদা প্রীতিলতার মধ্যে দেখেছিলেন এক বীরয়সী নারীর রূপ।

তাই তিনি বলেছিলেন—'তোকে হৃদয় উজাড় করে স্নেহ করছি, তোর গুণ দেখে মুগ্ধ হয়েছি, তোর ভগবৎভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি, তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশেছি।'

যতদূর জানা যায় মাস্টারদা প্রীতিলতাকে যুদ্ধ করতে যাওয়ার আগে তাঁকে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একটি ছবি। সেই ছবিটিই মৃত্যুর পর প্রীতিলতার দেহ তল্লাশি করে পাওয়া গিয়েছিল।

বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ ঘোষের 'ভবানী মন্দির' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বোঝা যায় বিপ্লবীদের মধ্যে ছিল ভগবৎ প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা। মাস্টারদা নিজেও ভগবৎ প্রীতিকে অশ্রদ্ধা করতেন না।

আজকে ভাবতে আশ্চর্য লাগে—ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রশাসনে একটু লবণ তৈরি করার অধিকার পর্যন্ত ভারতবাসীর ছিল না। বিদেশি বস্ত্র ছাড়া কাপড় ছিল না।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সমস্ত মহিয়সী নারী সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন নিজেদের জীবনের বিনিময়ে—তাঁদের কথা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আজ পর্যন্ত এক জায়গায় সংযোজিত হয়নি।

১৯০৫ সাল থেকে প্রাক্-স্বাধীনতা কাল পর্যন্ত দেশপ্রেমী মানুষের কাছে একটাই ব্রত ছিল—মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন। কত নারী নিজেদের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের ভূমিকা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এই প্রজন্মের জানা উচিত। সন্ত্রাসবাদ না অহিংস আন্দোলন কোনটি সঠিক ছিল—এই প্রশ্ন করে আজ আর লাভ নেই—স্বাধীনতা আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকাকে নগণ্যভাবে দেখা ঠিক হবে না।

যুবকদের মতো যুবতীদের হয়তো সেইভাবে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবুও কতিপয় নারী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবে আমরা তাঁদের কথাই উল্লেখ করতে প্রচেষ্টা নিয়েছি।

।। এগারো ।।

রঙ্গিলা চা বাগানে ব্যাচেলার কাকার সাথে এসেছিলেন ভাইঝি বুড়ি। ব্যাচেলার কাকা পার্বত্য চা বাগানে এসেছিলেন ডাক্তার হয়ে। এলাকাটি চট্টগ্রামের অন্তর্গত।

পিসিমার জনমানবহীন জায়গাটি ভাল না লাগলেও বুড়ির ভাল লেগেছিল। চা-বাগানটিতে ছিল রকমারি পাখি, ধ্যানগম্ভীর পর্বতটির যেন কেমন একটা মাদকতা ছিল। চতুর্দিকে অপরূপ দৃশ্য। সকাল-সন্ধ্যায় পাহাড়ের কোল ঘেঁসে যে নদীটি গিয়েছে—তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল বুড়ি। বুড়ি মন দিয়ে শুনত গাছে বসা বুলবুলি ও টুনটুনির কিচিরমিচির।

রঙ্গিলা চা বাগানের প্রাকৃতিক শোভা বুড়িকে বেশ ভালভাবেই আকর্ষণ করেছিল। ডাক্তার কাকার বাংলো থেকে বেশ কিছুদূরে ছিল কুলিবস্তি। সন্ধ্যার অন্ধকারে বুড়ির যেন কেমন ভয় ভয় করছিল। সে বুঝতে পারেনি সেদিন সে কুলিবস্তির কাছে এসে গিয়েছে। ভাবল কোন কুলির সাহায্য নিয়ে সে বাড়ি ফিরবে, তাই গিয়েছিল কুলিবস্তিতে।

কুলি বস্তির কাছে যেতেই—বুড়ি শুনতে পেল কে যেন বলছে অরুণ কষ্ট কি খুব বেশি হচ্ছে। পরে জেনেছিল অরুণ নামের লোকটি বিপ্লবী অরুণ গুহ। সাথের লোকটি ছিলেন বিপ্লবী চিত্ত ভট্টাচার্য।

চিত্ত ভট্টাচার্য নিজেদের পরিচয় দিতে বাধ্য হলেন বুড়ির কাছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম দরজায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ফিসফিস করে বললেন—দরজা খোল। তাঁর হাতে ছিল রিভলভার।

বুড়ি বুঝতে পেরেছিল এদের দু'জনের বিরুদ্ধেই হুলিয়া বেরিয়েছে। এরা আত্মগোপন করে আছেন এই পার্বত্য অঞ্চলে। বুড়ি দরজা খুলে দিলে চিত্তবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। চিত্তদা কয়েকটি ঔষধ চাইলে কাকার ঘরে তাঁকে নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় ঔষধগুলি দিল।

চিত্তদাকে বুড়ি প্রশ্ন করেছিল—

—কি অসুখ অরুণবাবুর?

—অরুণবাবু অসুস্থ তাও জান দেখছি।

—জানি।

—অরুণের পায়ে গুলি লেগেছিল—ঘা হয়েছে।

—গুলি?

—কেন হুলিয়ার কথা জান না?

—এবার বুঝেছি—অরুণ-গুহ এবং চিত্ত ভট্টাচার্যের নামে হুলিয়া বেরিয়েছে।

চিত্তবাবুকে প্রণাম করতে চাইল বুড়ি। তাঁকে দাদা বলে সম্বোধন করল। প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিস নিয়ে সেদিন রাতের অন্ধকারে মিশে গিয়েছিলেন চিত্ত ভট্টাচার্য।

অনেকদিন বাদে বুড়ি কলকাতায় এসেছিল। জানতে পেরেছিল চিত্তদা নাটকে অভিনয় করেন। নাটকের হলে গিয়ে বুড়ি চিত্তদার সাথে দেখা করেছিল।

চিত্তবাবু বুড়িকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। বুড়িকে নিজের বাড়ি ঠিকানা দিয়ে আসতে বলেছিলেন।

বুড়ি গিয়েছিল চিত্তদার বাড়িতে। দেশব্রতী অভিনেতার ঘরের চেহারা ছিল অত্যন্ত মলিন।

চিত্তদাকে বুড়ি অরুণদার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বুড়ির প্রশ্ন শুনে পাশের ঘরে নিয়ে এসেছিল চিত্তদা বুড়িকে।

সেই ঘরে একটা বই হাতে নিয়ে অরুণ গুহ বসেছিলেন একটি ইনভ্যালিড চেয়ারে, একটি পা ছিল তাঁর আগাগোড়া কাটা, বাঁ হাতেরও সব অংশ ছিল না। চিত্তদাই বলেছিলেন অরুণের খুব কষ্ট। অরুণদাকে দেখে বুড়ির চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।

বুড়ি কাতরতা নিয়ে চিত্তদাকে উদ্দেশ করে বলেছিল—দেশের স্বাধীনতার জন্য এত করলেন—সবই তো বিফল হয়ে গেল।

চিত্ততা বুড়ির কথার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—কোন প্রচেষ্টাই বিফল হয় না। একদিন না একদিন আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবেই। বিফলতার মধ্যেই থাকে সফলতার বীজ।

দেশ স্বাধীন হতে বুড়ি গিয়েছিল চিত্ত ভট্টাচার্যের খোঁজে। জানতে পারল—চিত্তবাবু মারা গিয়েছেন আর অরুণ-গুহ আত্মহত্যা করেছেন।

বুড়ি এক বুক ব্যথা নিয়ে ফিরে এসেছিল এই খবব শুনে।

প্রীতিলতার কথায় আবার ফিরে যাই। মাস্টারদার সাথে নির্মল সেন প্রীতিলতাকে আলাপ করে গিয়েছিলেন।

প্রীতিলতা আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে পারত না। নির্মল সেন প্রীতিলতাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন কি ভাবে Trigger টিপতে হয়।

মাস্টারদা প্রীতিলতাকে নিজের বোনের মতোই ভালবাসতেন। মাস্টারদা প্রীতিলতাকে ডাকতেন 'রানী' নামে।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে কয়েদীবেশে কারাগারে দেখেছিল প্রীতিলতা অনেকবার নানারকম কায়দায় আলিপুর জেলে প্রীতিলতা রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে দেখতে গিয়েছিলেন।

নির্মলদা সব সময় বলতেন—আমাদের দলে তিনটি রানী আছে—of which you aie the eldest.

প্রীতিলতা উত্তর দিয়েছিল—এই তিনটি মেয়ে বিপ্লবীব মধ্যে আমাকে নিশ্চয়ই বলা যায়—লোহার বরনী বানী? নির্মল সেন প্রীতিব কথা শুনে বলেছিলেন—লোহার বরনী রানীকেই আমাব সব থেকে পছন্দ।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে অনেক কিছু বলা যায়—স্বল্প পবিসরে তা সম্ভব নয়। নির্মল সেনের মৃত্যুব পর যখন মাস্টারদা চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন—তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—"তোকে এখন কোথায় নিয়ে যাব—তোর life-টাও নষ্ট করলাম।" মাস্টাবদা বাধ্য হলেন প্রীতিলতাকে সঙ্গে নিতে।

বিপ্লবী জীবনে নারী হয়েও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

প্রীতিলতার কথা আর বাড়াব না। আগে বলা হয়েছে এবার আবাব ফিরে আসি প্রচার না পাওয়া কুমিল্লার দুই কিশোরী শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরীর বিপ্লবী জীবনের কথায়। কিশোরী হলেও স্কুলের ছাত্রী শান্তি ঘোষ ভারতবর্ষের পরাধীনতার কথা ভেবে মর্মাহত হতেন। শান্তি ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দের আত্মীয়া ছিলেন। শান্তি ঘোষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের বোনের নাতনি। দেশমাতৃকার শৃঙ্খলে বন্ধন শৈশব থেকে শান্তি ঘোষ সহ্য করতে পারতেন না। সরোজিনী নাইডু তাঁর একটা বক্তৃতায় শান্তি ঘোষের কণ্ঠে মুক্তগীতির প্রশংসা করেছিলেন।

শান্তি ঘোষ ছিলেন 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের সদস্য। শান্তির জন্মের তারিখ ১৯১৬ সালের ২২শে নভেম্বর। মাতৃশৃঙ্খল মোচনের একটা প্রেরণা তার সব সময় মনের ভিতর উথালি-পাতালি করত।

শান্তি ঘোষ এক সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নেতাজির কাছেই শান্তি ঘোষ প্রথম শুনেছিলেন 'নারীজাতির সম্মান রক্ষা

কর।' দেশের পরাধীনতাকে উপড়ে ফেলতে নারী জাতিরও একটা বিরাট ভূমিকা আছে। পুরুষ বিপ্লবীদের সাথে নারীকেও হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে। নিজেকে সশস্ত্র নারী বিপ্লবী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শান্তি ঘোষ লাঠি, ছোরা, রিভলভার ছোড়া শিখেছিলেন অত্যন্ত মনোযাগ সহকারে।

শান্তি ঘোষ দলের বিশেষ দায়িত্বর জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন। এসেও গেল সেই দায়িত্বভার, শান্তি ঘোষের উপর দায়িত্ব দেওয়া হল কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করার।

১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করার জন্য রিভলভার নিয়ে রওনা হলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর দিকে। শান্তি ঘোষের সঙ্গে ছিলেন আর এক বিপ্লবী মহিলা কিশোরী সুনীতি চৌধুরী। সুনীতি চৌধুরীও ছিলেন কুমিল্লার মেয়ে। তিনিও মাতৃভূমির পরাধীনতাকে মেনে নিতে পারছিলেন না। ইংরেজ প্রশাসনের উপর ছিল তাঁর দারুণ ক্রোধ।

সুনীতির জন্ম তারিখ ছিল ১৯১৭ সালের ২২শে মে। সুনীতি ছিলেন কুমিল্লা গার্লস কলেজের ছাত্রী।

সুনীতির দাদারা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন।

সুনীতির জোড়া গুলি লেগেছিল কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বুকে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। শান্তি ও সুনীতি বুঝেছিলেন তাঁদের ইঙ্গিত কাজ হাসিল হয়েছে।

সুনীতি চৌধুরী শৈশব থেকেই মাতৃভূমির পরাধীনতা বরদাস্ত করতে পারেননি। মহান বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের প্রতি ব্রিটিশ প্রশাসনের নিষ্ঠুর অত্যাচার সুনীতি চৌধুরীকে বেদনাতুর করে তুলেছিল। তাঁর মন বলছিল বদলা চাই বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন বলিদান করতে প্রস্তুত ছিলেন সুনীতি চৌধুরী।

কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা অপরাধে সুনীতি ও শান্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। তাঁদের যেতে হল দ্বীপান্তরে।

শান্তি ও সুনীতি দেশের জন্য সাতটা বছর কারাগারে কাটিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে গান্ধীজির প্রচেষ্টায় শান্তির বন্দিজীবনের অবসান হল। এর পর শান্তি পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে আই-এ পাশ পর্যন্ত করেছিলেন। শান্তি ১৯৪২ সালে এক স্বাধীনতা বিপ্লবীর সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

সুনীতির সহপাঠী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম ছিলেন যুগান্তর দলের সদস্যা। তিনি সুনীতিকে বিপ্লবী দলে এনেছিলেন।

কুমিল্লার একাধিক কিশোরী বিদেশি প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। বেশ কিছু কিশোরী মিলে তৈরি করেছিলেন একটি 'ছাত্রী সংঘ', নেতৃত্বে ছিলেন সুনীতি চৌধুরী।

শান্তি ও সুনীতির বিপ্লবী জীবন থেকে বেশ কিছু কিশোরী ও যুবতী ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। স্টিভেন হত্যার কথা আজ অনেকেই জানেন না। সুনীতি বা শান্তি প্রীতিলতার মতো প্রচার পাননি। অথচ কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার আসামী তারা। এঁরাও কিছু চাননি। এঁদের একটু স্মরণে রাখলে দোষ কি? কি কায়দায় তারা স্টিভেনকে গুলি করেছিলেন তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করে সুনীতি ও শান্তি ধরা পড়েছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতেই। বেজে উঠেছিল পুলিসের পাগলা ঘণ্টি। নির্দয়ভাবে অত্যাচারিত হলেন এই দুই কিশোরী। গ্রেপ্তার হবার পরে অনেক জেরা চলল। একটি কথাও বার করা গেল না শান্তি ও সুনীতির মুখ থেকে। ওরাও মাতৃশৃঙ্খল মুক্তে নিবেদিতপ্রাণ। ওরা মুখ খুলবে কেন জেরার মুখে?

সুনীতিকে যখন কুমিল্লা জেলে নিয়ে যাওয়া হল তখন তাঁর বয়েস ছিল মাত্র ১৪। এরপর সুনীতিকে নিয়ে আসা হয় আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলে।

এই কিশোরীদের কোর্টে দেখতে শত শত সাধারণ মানুষ আসতেন। শান্তি ও সুনীতির চোখে ছিল বিদ্রোহের দৃষ্টি। ভয় বলে ওরা কিছু জানত না। ২৭ জানুয়ারি শান্তি ও সুনীতির মামলার রায় হয়েছিল। কিশোরী বলে শান্তি ও সুনীতিকে মৃত্যুদণ্ডের বদলে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। কাজটা হওয়ার পর গান গাইতে গাইতে তাঁরা পুলিসের ভ্যানে উঠেছিলেন।

মুক্তি পেয়ে সুনীতি নিজেকে তৈরি করেছিলেন। ডাক্তার হয়েছিলেন সুনীতি চৌধুরী, আর্ত মানুষের সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

সুনীতি অবশ্য দেশের স্বাধীনতা দেখে গিয়েছিলেন।

বীণা দাস (ভৌমিক) এর নাম উল্লেখ হলেও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হয়নি। তাই ফিরে যেতে হচ্ছে বীণা দাসের আলোচনায়। বীণা দাস (ভৌমিক) ছিলেন পাঁচ ফুট লম্বা। তাঁর শরীরের রঙ ছিল ফর্সা। ভারতবর্ষের ইংরেজ প্রশাসন বিপ্লবীদের একটি হট্ লিস্ট তৈরি করেছিল বিপ্লব চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। যতদূর জানা যায় সেই হট লিস্টে বীণা দাসের নাম ছিল প্রথম সারিতে।

বীণা দাস ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তিনি ব্রত গ্রহণ করেছিলেন—হয় ইংরেজ নিধন করব, নয়তো নিজের জীবন বলিদান করব মাতৃভূমির মুক্তিমন্ত্রে।

বীণা দাসও ছিলেন কল্পনা দত্তের মতো বেথুন কলেজের ছাত্রী। তিনি পরিকল্পনা নিয়েছিলেন—তৎকালীন বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যা করার।

কনভোকেশন হলে বাংলার গভর্নরের কয়েক হাত পিছনে ছিলেন বিপ্লবী বীণা দাস। শাড়ির আঁচলের আড়ালে রাখা ছিল তাঁর গুলিভর্তি রিভলভার। তিনি একের পর এক গুলি চালিয়েছিলেন। গভর্নর এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা বীণা দাসের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দৌড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করলেন।

বীণা দাসের মত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী সরাসরি প্রশ্নের জবাবে বলতে পেরেছিলেন—'আমরা কি সত্যিই স্বাধীন হয়েছি? ইট ইজ ওনলি দ্য ট্রান্সফার অফ পাওয়ার। নট ফ্রিডম।'

বীণা দাসের মতো বিপ্লবী অক্লেশে বলেছিলেন—দেশমাতৃকার শৃঙ্খল খুলতে এত যে সংগ্রাম করলাম—তার বোধহয় খুব সার্থক রূপ পেল না। আমি নিশ্চয় চাইনি এই প্রজন্ম ভুলে থাক শহিদদের আত্মত্যাগের কথা। বীণা দাস ইংরেজের নাম একদম শুনতে পারতেন না। বীণা দাস কলেজে পড়ার সময় ছিলেন ইংরেজির ছাত্রী। ইংরেজি খুব ভাল জানতেন, ইংরেজদের সহ্য করতে না পারলেও ইংরাজি ভাষা ছিল বীণা দাসের খুব প্রিয় ভাষা।

বীণা দাসের মতো বিপ্লবীর শেষ পরিণতি ছিল ভীষণ করুণ। ঊনবিংশ শতকের নবম দশক। হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটে এক অজ্ঞাতপরিচয় বয়স্কা মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। সংবাদপত্রেও খবরটি উঠেছিল। পরে অজ্ঞাতনামা মহিলার পরিচয় জানা গিয়েছিল। সেই মহিলা ছিলেন বীণা দাস (ভৌমিক)। কি মর্মান্তিক শেষ পরিণতি।

শুনেছি বীণা দাসকে খুব স্নেহ করতেন বাসন্তীদেবী। বাসন্তীদেবীকে তিনি নাকি মা বলে ডাকতেন।

বীণা দাসকে তদানীন্তনকালের সব নামী নেতারাই চিনতেন। সম্মান করতেন। তিনি স্বাধীনতার পর বিধানসভার সদস্যা হয়েছিলেন।

বীণা দাসের স্বামী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ শ্রীযতীশ ভৌমিক। স্বামীর মৃত্যুর পর বীণা দেবী কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। একটা

অস্বাভাবিক ভাব লক্ষ্য করা যেত তাঁর মধ্যে।

কখন যে তিনি হরিদ্বার চলে গিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেন না। খবরের কাগজ থেকেই জানা গিয়েছিল, বীণা দাসের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল—হরিদ্বারে। বীণা দাসকে কি ভোলা যায়? সশস্ত্র বিপ্লবী নারীদের সম্বন্ধে আলোচনা করলেও অহিংস আন্দোলনের সাথে যে সমস্ত নারী যুক্ত থেকে বিপ্লব করেছেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে শামিল হয়ে গ্রেপ্তার বরণ করে জেলে গিয়েছেন। বিচারে অনেকেই সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন তাঁদের কথাও বা ভুলি কী করে? এঁদের ভূমিকাও স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন অংশে কম ছিল না।

অহিংস আন্দোলনে নারী বিপ্লবীদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে তমলুকের মাতঙ্গিনী হাজরা, কল্পনা যোশী, সরোজিনী নাইডু, সুচেতা কৃপালনি, নেলী সেনগুপ্তার কথা। সবলা দেবী চৌধুরাণী বাহ্যিকভাবে অহিংস আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকলেও সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভিতরে ভিতরে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। নিজের স্বামী রামভুজ চৌধুরীও ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী। যদিও এই সব অহিংস আন্দোলনে যুক্ত বিপ্লবী নারীর কথা অনেকেই কম বেশি জানেন।

কিন্তু বিপ্লবী বেথুয়াডিহির সাবিত্রী বালার বিপ্লবী জীবনের কথা অনেকেই জানেন না। ক্ষুরধার স্মৃতিশক্তির অধিকারী সাবিত্রীবালা দেবী। বিপ্লবী জীবনের বহু কথাই তাঁর আজও মনে আছে।

সাবিত্রীবালাকে ইংরেজ প্রশাসনের পুলিস গ্রেপ্তার করেছিল ১৯৩২ সালের ২৬ জানুয়ারি। এই সময় বেথুয়াডিহিতে ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সাবিত্রীবালা দেবী—গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন—তোমরা সভার কাজ চালিয়ে যাও, আমি এসে আবার হাল ধরব, সাবিত্রীবালা ১৯৩৩ সালে আবার গ্রেপ্তার হলেন আইন অমান্য আন্দোলনে। তাঁকে এবার রাখা হল কুষ্ঠিয়ার মেহেরপুর জেলে। সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে। এইবার তাঁকে আটমাস জেলে খাটতে হয়েছিল।

সাবিত্রীবালা দেবী নিজেই বলেছিলেন তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন—হেমপ্রভা মজুমদার, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, বিমল প্রতিভা দেবী, লাবণ্য চন্দ, শান্তি দাসের কাছে।

১৯৩০ সালে সাবিত্রীবালা দেবী নেতাজির সান্নিধ্যে প্রথম এসেছিলেন করাচিতে। এ ছাড়াও বহরমপুরে নেতাজির সাথে খুব ঘরোয়াভাবে আলাপ আলোচনা হয়েছিল সাবিত্রীবালা দেবীর।

সাবিত্রীবালা দেবী কিন্তু খুব খোলামেলাভাবে নিজের মনের কথা বলতে গিয়ে প্রকাশ করেছিলেন—এই স্বাধীনতা আমরা চাইনি। আজ মনে হচ্ছে আমরা এই ধরনের স্বাধীনতা না পেলেই ভাল হত।

বর্তমানে যে ধরনের রাজনীতি চলেছে—তার জন্য আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিপ্লব ছিল না।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে বৈধব্য জীবনে গান্ধীজির আদর্শে তিনি স্বাধীনতা যজ্ঞে অনুপ্রাণীত হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন বিপ্লবী কাজকর্মে।

সাবিত্রীবালা দেবী পড়তেন বিদ্যাসাগর উইমেনস্ কলেজে।

সাবিত্রীবালা দেবী অবশ্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পেয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বীকৃতি হিসেবে তাম্রফলক। সরকারি পেনশনও তিনি পাচ্ছেন সাবিত্রীবালা দেবী কিন্তু অন্যান্য অহিংস আন্দোলনকারী মহিলাদের মতো প্রচার পাননি।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র এবং অহিংস আন্দোলন দুই কাজ করেছে। বহু নারী সশস্ত্র ও অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন দেশের পরাধীনতা ঘোচাতে।

বিপ্লবের ক্ষেত্রে নারীদের অবদানের কথা কখনই ছোট করে দেখা উচিত নয়।

অনেক অনেক ভারতীয় নারী হয়তো আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবীর অসীম সাহসে আশ্রয় দিয়েছিলেন বিপদের দিনে।

মাস্টারদা অর্থাৎ সূর্য সেন ধরা পড়েছিলেন গৈরালা গ্রামে বৃদ্ধা ক্ষীরোদাপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ি থেকে। মহিলা পরবর্তীকালে আর্থিক দিক থেকে কষ্ট পাচ্ছিলেন। স্বাধীনতার পর লোকনাথ বল কলকাতা কর্পোরেশনের অ্যান্টিকরাপশন অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ক্ষীরোদাপ্রভার অবস্থার কথা জানাতে পেরে এককালের সশস্ত্র বিপ্লবী লোকনাথ বল ক্ষীরোদাপ্রভা দেবীকে তাঁর মায়ের সাথে নিজ বাসায় থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। বিপ্লবীরা যে বিপদের দিনে আশ্রয়দাত্রীদের ভোলেননি—তা বোঝা যায় এই ঘটনাটির মাধ্যমে।

।। বারো ।।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনে কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে হয়েছিল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেসের নেতৃত্ব অনুধাবন করেছিলেন— নারীদের যুক্ত করতে না পারলে আন্দোলনের সাফল্য আসবে না। নারী একটা বড়ো শক্তি। তাদের কেন স্বাধীনতা আন্দোলনে বাইরে রাখা হবে? ঠিক হল যোগ্য নারীদেরও কংগ্রেসে নেওয়া হবে।

কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন হয়েছিল আবার বোম্বাই শহরে। বোধহয় ১৮৮৯ সালে। এই পঞ্চম অধিবেশনে মহিলারা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ থেকে যোগ দিয়েছিলেন তদানীন্তন বাংলার প্রথম স্নাতক ও চিকিৎসক ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবং ঠাকুর পরিবারের স্বর্ণকুমারী দেবী।

১৮৯০ সালে কলকাতায় হয়েছিল কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন। এই ষষ্ঠ অধিবেশনে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন মহিলা সংগঠন তৈরি করে তাদের মধ্যে স্বদেশি প্রচার অভিযান চালনা করতে। মহিলারা যাতে আত্মনির্ভরশীল হতে পারেন তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদি। স্বর্ণকুমারী দেবী পরবর্তীকালে দুটি কাগজ 'ভারতী' ও 'বালক' কাগজের সম্পাদিকা হয়েছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম দিকে কিছু উচ্চশিক্ষিত লোকের যোগদানের ফলে ইংরাজির আলোচনাই বেশি হত, এই কারণে মেয়েদের বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গর আন্দোলন হয়। এরপর ১৯০৬।৭ সালে ঢাকায় অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় বিপিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে। এই অনুশীলন পার্টি ছিল বিপ্লবী দল। অবিবাহিত যুবকরা কেবলমাত্র ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্য হতে পারতেন। এদের ব্রত ছিল পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে স্বাধীন করা।

এ ছাড়া বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে বীরয়সি মহিলারা বিপ্লবাত্মক কাজ ছাড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন—তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় এক বিদেশিনীর। সরলা দেবী বাহ্যিকভাবে অহিংস আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হলেও সশস্ত্র বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। মিস্টার নিবেদিতা সরলা দেবী চৌধুরীকে সশস্ত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব চেষ্টা করতেন।

বিপ্লবী বারীন ঘোষের সাথে সরলা দেবী ও সিস্টার নিবেদিতার যোগাযোগ ছিল।

১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর সিস্টার নিবেদিতা যেন আরও বেশিভাবে জড়িয়ে পড়লেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে। ১৯০৩ সালে যুক্ত হলেন অরবিন্দর বিপ্লবী সংগঠনের সাথে।

ভাবা যায় একজন বিদেশি মহিলা কি পরিমাণ ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন। নিজেকে তিনি ভারতবাসী হিসেবেই ভাবতেন। সিস্টার নিবেদিতা আমরণ নারীশক্তিকে জাগ্রত করার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিলেন।

বঙ্গনারীর প্রেরণাদাত্রী হিসেবে সিস্টার নিবেদিতাকে বোধহয় কেউ কোনওদিন ভুলতে পারবে না। তিনি যে ছিলেন নারী স্বাধীনতা সংগ্রামে যেই সব বঙ্গনারী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে—সেই সব নাবীকে শ্রদ্ধা জানাই স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দিতে।

প্রীতিলতার বাড়ি ছাড়ার যে গানটি গেয়েছিলেন—আজও তা হয়তো অনেকের মনে আছে, গানটি ছিল—"শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও—জননী এসেছে দ্বারে" স্বাধীনতা কি আমরা সত্যিই পেয়েছি?

।। তেরো ।।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবে নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রেপ্তারবরণ করেছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবা রমণী ননীবালা দেবী।

হাওড়া জেলার বালিগ্রামে এক অতি নিম্নমধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে ননীবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে মেয়েদের পড়াশোনা করার বিশেষ সুযোগ ছিল না। তাই প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ননীবালা পড়াশোনা করে পড়াশোনার প্রতি ইতি টানতে বাধ্য হয়েছিলেন। মাত্র এগার বছর বয়সে ননীবালার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেই ননীবালার স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় ননীবালা বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হলেন। বিধবা বেশে ফিরে এলেন পিতৃগৃহে।

ওই বয়সে কোন কিছুতেই মন না বসায় আড়িয়াদহের গঙ্গার পাড়ে খ্রিস্টান মিশনে ইংরেজি শিখতে শুরু করলেন বিধবা ননীবালা। কিন্তু সামাজিক চাপে ইংরেজি শেখাও তাঁর বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি আড়িয়াদহও তাঁকে ছাড়তে হল, অনেক চেষ্টার পর তিনি আশ্রয় পেলেন অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

ভাইপো অমরেন্দ্র ছিলেন 'যুগান্তর' দলের একজন বিপ্লবী সৈনিক ননীবালাও ভাইপোর বিপ্লবী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত হন।

বিপ্লবীদের খোঁজ পেলেন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিস। সশস্ত্র বিপ্লবীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লুকোবার জায়গা পাচ্ছিলেন না। ননীবালার সঙ্গে ছিল যুগান্তর দলের এইসব বিপ্লবীদের যোগাযোগ। তিনি এইসব সশস্ত্র বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে লাগলেন তাঁর রিষড়ার বাড়িতে।

পুলিস বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করার জন্য হন্যে হয়ে লাগল। ইতিমধ্যে বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার হলেন। রামচন্দ্রের কাছে ছিল একটি পিস্তল। পিস্তলটি পুলিসের চোখে পড়ল না। রামচন্দ্র কারাগারে বন্দি জীবন কাটাতে শুরু করলেন গ্রেপ্তারের সময় পিস্তলটির অবস্থান রামচন্দ্র কারওকে বলে যাওয়ার সুযোগ পাননি।

একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল ননীবালা দেবীর সাহসিকতায়।

ননীবালা দেবী বিধবা হয়েও রামচন্দ্রের স্ত্রী সেজে প্রেসিডেন্সি

জেলে গিয়ে রামচন্দ্রের সাথে দেখা করে জেনে নিয়েছিলেন রামচন্দ্র কোথায় তাঁর 'মাউসর' পিস্তলটি রেখেছেন। রামচন্দ্রের কাছ থেকে জেনে এসে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পিস্তলটি সরিয়ে ফেলেছিলেন ননীবালা দেবী।

পরে অবশ্য পুলিস জানতে পেরেছিল সত্যি সত্যি ননীবালা রামচন্দ্রের স্ত্রী নন।

ননীবালাকে গ্রেপ্তার করে নির্মমভাবে পুলিস অত্যাচার চালিয়েছিল তাঁর উপর। এমনকি শাস্তিকুঠরিতে পর্যন্ত রাখা হয়েছিল ননীবালাকে। বিপ্লবী দলের একটি কথাও বার করা যায়নি ননীবালার মুখ থেকে। তাঁকে উলঙ্গ করে লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর সর্ব দেহে। সেই জ্বালা সহ্য করেও ননীবালা মুখ খোলেননি।

ননীবালা একবার পুলিসের স্পেশাল সুপার মিঃ গোল্ডিকে তার ব্যবহারের জন্য ঠাস করে তার গালে চড় মেরেছিলেন। গোল্ডি সাহেব ননীবালার মতো বাল্য বিধবার কাছ থেকে এমনভাবে লাঞ্ছিত হবেন—তা ভাবতে পারেননি। ননীবালা জেল খাটার পর ছাড়া পেয়ে খুব সুস্থভাবে বাঁচতে পারননি। অনাহারে, অত্যাচারে তাঁর টি-বি হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের মে মাসে তিনি মারা গেলেন। বাংলা হারাল বিপ্লব বিদ্রোহিনী অকুতোভয় এক বীরয়সী নারীকে।

ননীবালা দেবীকে কি স্বাধীন ভারতের লোকেরা মনে রেখেছে? ননীবালা দেবী তো প্রচার পাননি।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হলে হয়তো ননীবালা দেবীর কথা উঠতে পারে। কিন্তু ননীবালার ছবি পাওয়াও বর্তমানে কষ্টকর। ননীবালারা কি শুধু দিয়েই গেলেন?

আবারও বলছি নারী বিপ্লবীদের বোধহয় আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী বিপ্লবীরা প্রায় সবাই ছিলেন সাধারণ বাঙালি ঘরের মেয়ে। বিপ্লব ওঁদের ডাক দিয়েছিল। পরাধীন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসনের নির্মম অত্যাচার ও বে-আইনি কার্যকলাপ ওঁদের বাধ্য করেছিল নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে ওদের বিদ্রোহিনী হতে।

আবারও উল্লেখ করতেই হচ্ছে—দেশের পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন প্রীতিলতা, কল্পনা, রানী, পারুল, উজ্জ্বলা, সুনীতি, শান্তি ননীবালা, প্রফুল্লনলিনী ও আরও অনেকে।

এই সব বিপ্লবী নারীরা সবাই ছিলেন অবিভক্ত বাংলার মেয়ে, এঁরা যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন বিপ্লবী দলে। এদের মধ্যে কেউ বা অসীম সাহসে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছেন আবার কারো কারোকে বা গ্রেপ্তার বরণ করে বিভিন্ন মেয়াদের সাজা খাটতে হয়েছিল।

এইসব দেশপ্রেমিক বিপ্লবী নারীর কথা স্মরণ করলে এখনও গর্বে মন ভরে যায়।

তাই বোধহয় ভারতীয় নারীদের কথা বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—মানসিক জোর এবং তেজস্বিতা থাকলে ভারতীয় নারী ও অগ্নিকন্যা হয়ে উঠতে পারেন। স্বামীজি বলেছিলেন—নারীর মধ্যে রয়েছে এক বিরাট শক্তি। সেই শক্তিকে পদানত করে রাখা হয়েছে।

ভারতবর্ষের বুকে নারীদের বহুবিধ সামাজিক সমস্যা থাকলেও স্বাধীনতার মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পুরুষ বিপ্লবীদের সাথে সমভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন সশস্ত্র এবং অহিংস নারী বিপ্লবীরা। কোন বাধাই ওঁদের রোধ করতে পারেনি। ওঁদের নিয়ে একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা হল না কেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছরের মধ্যে?